মনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৬৬

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
৬ চালতাবাগান লেন,
কলিকাতা ৬

৪৬৪৫
STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA
১৩.২.৬০

প্রচ্ছদ-চিত্র
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
মোহন প্রেস

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দুই টাকা পঞ্চাশ ন. প.

পরম প্রিয়

হুমায়ুন কবির

করকমলেষু

৯ শ্রাবণ, ১৩৬৬

এই লেখকের

উপন্যাস

মানুষ নামক জন্তু
রক্তের বদলে রক্ত
আগস্ট, ১৯৪২
এক বিহঙ্গী
ওগো বধূ সুন্দরী
জলজঙ্গল
নবীন যাত্রা
বকুল
বাঁশের কেল্লা
বৃষ্টি, বৃষ্টি !
ভুলি নাই
শত্রুপক্ষের মেয়ে
সবুজ চিঠি
সৈনিক
আমার ফাঁসি হল

ভ্রমণ

চীন দেখে এলাম ১ম
ঐ ২য়
সোবিয়েতের দেশে দেশে
পথ চলি
নতুন ইয়োরোপ : নতুন মানুষ

গল্প

গল্প-সংগ্রহ (১ম খণ্ড)
একদা নিশীথকালে
কাচের আকাশ
কিংশুক
কুঙ্কুম
খদ্যোত
দেবী কিশোরী
নরবাঁধ
পৃথিবী কাদের ?
মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প

নাটক

নূতন প্রভাত
প্লাবন
বিপর্যয়
বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং
রাখিবন্ধন
শেষ লগ্ন
ডাকবাংলো
(দেবনারায়ণ গুপ্ত নাটকায়িত)

এক

দু-শ বছরের মায়া কাটিয়ে ইংরেজ তল্পিতল্পা বাঁধছে, সেই সময়ের গল্প।

লাহোর। শান্ত শহর। কিন্তু ভিতরে ভিতরে মানুষ আর-এক রকম। দিব্যি চলেছে বড় রাস্তা দিয়ে, থেমে গিয়ে হঠাৎ পিছনে তাকায়। ছোরা মারে কি না কেউ ওদিক থেকে! মেয়েরা একা-দোকা বেরোয় না, সন্ধ্যা না হতেই ঘরে ঢুকে খিল দেয়। দলে দলে লোক এসে পড়ছে বাইরে থেকে, তাদের মুখে নানান খবর। কোন গাঁয়ে নাকি শিখেরা দল বেঁধে হামলা দিয়ে যত মুসলমান নিপাত করেছে। ডেপুটি-কমিশনার নিজে তদারকে ছুটলেন। মিছে কথা, বাজে গুজব। কিন্তু শহরের কেউ বিশ্বাস করে না। বলে, ঘুষ খেয়ে চেপে দিচ্ছে।

একদিন এক কাণ্ড হল। মড়া পুড়িয়ে ফিরছে—কোথা থেকে একদল এসে পথ আটকে তাদের গায়ে পিচকারি মারে। হোলির দিনে এই রকম ঘটে কোন কোন মহল্লায়—মুসলমান ছেলেরাও মাতামাতি করে হিন্দুর সঙ্গে। কিন্তু আজকে ফাগ নয়, কেরোসিন। কেরোসিনে কাপড়চোপড় ভিজিয়ে দেশলাই-কাটি জ্বেলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। ধরে গেল কারও কারও কাপড়। কাপড় ফেলে তারা ছোটে। হাততালি আর উৎকট হাসির শব্দ গলিঘুজির ভিতর থেকে।

সেই লেগে গেল। দিনমানটা এক রকম, রাত্রি হলেই তাণ্ডবের শুরু। এদিক থেকে শুনবেন—আল্লা-হো-আকবর, ইয়া আলি, ইয়া আলি। পালটা ওদিকে—সৎশ্রী আকাল। গুলির আওয়াজ। হঠাৎ বা আর্তনাদ উঠল: দোহাই বাবা সকল, রক্ষে কর, রক্ষে কর—। বোমা ফাটছে দুড়ুম-দাড়াম। ছাত ভেঙে পড়ল যেন কোনদিককার। রাস্তার আলো নেই—আলোর পোস্ট ভাঙা, তার ছেঁড়া।

সকালবেলা খবর পাওয়া যায়ঃ রঙমহালে লুঠপাট, গুমতি-বাজারে তিনটে খুন। যত বেলা হচ্ছে, খবর আসে দূর-দূরন্তর থেকে। ইস্কুল-কলেজ বন্ধ, ছেলেপুলে বাড়ির ভিতরে দুয়োর এঁটে আটকে রেখেছে। স্টেশন লোকে লোকারণ্য। অমৃতসরের ট্রেন ছাড়ল। গাড়ির ভিতরে যত মানুষ, ছাতের উপর তার ডবল। দুয়োর ধরে ঝুলছেই বা কত! কামরার নিচে চাকার পাশে লোহার উপরেও মানুষ সেঁধিয়ে আছে। সিন্ধ-এক্সপ্রেস এসে পড়ল, ভলন্টিয়ার ছুটেছে। জীবন্ত প্যাসেঞ্জার অল্প। একটা মেয়ে-কামরার ভিতরে—উঃ, চোখ মেলে তাকান যায় না! মায়ের বুকে বাচ্চা শিশু দুধ খাচ্ছে, এক কোপে সেরেছে দু-জনকে।

অত বড় মেয়ো-হাসপাতাল—দু-তিন দিন তারা গেট বন্ধ করেছে। জায়গা নেই। নরেশ তেজভান-হাসপাতালের ডাক্তার। এক মিলওয়ালা বাপের নামে বানিয়ে দিয়েছে। আয়তনে বড় না হোক, ব্যবস্থা ভাল। নতুন আজ চারটে তাঁবু খাটান হল উঠানে, আধ ঘণ্টার ভিতরে ভরতি। সহকারী আনোয়ার বলে, সরে পড়ুন ডাক্তার সাব। আর নয়। যত দেরি হবে, মুশকিলে পড়বেন। হাসপাতাল বলে রেহাই দেবে মনে হয় না।

কিন্তু বললেই হয় না। কলকাতার বাগবাজারে মা আর ছোট ভাই আছে। নিজেদের বাড়ি—পৌঁছতে পারলে নিশ্চিন্ত। কিন্তু বেরিয়ে পড়ে কোন কায়দায়? ঝোড়ো সমুদ্র চারিদিকে—তার

মধ্যে যেন অনেক দূরের এক দ্বীপ। অনেক বিঘ্নবিপদ কাটিয়ে তবে তো সেই কলকাতা! তার উপরে ঝাড়া-হাতপা একলা মানুষ নয়। স্ত্রী আর দুই মেয়ে। সোমত্ত মেয়ে—ইরা আর নীরা। বললেই অমনি বেরুন যায় না।

কারফিউ। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সকাল ছ'টা। হাসপাতাল-বাড়ির তেতলার উপর কোয়ার্টার। ঘুম হয় না। মেয়ে দুটো ওঘরে, তারাও ঘুমোয় নি ঠিক। এমন সব রাতে ঘুমের কথা ওঠে না। সারা রাত্রি স্বামী আর স্ত্রীর শলা-পরামর্শ। কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ অমলা কেঁদে পড়ে: ছোট বোনটার গতি কী হল, তা-ও জানি নে। চিঠি দেয় না কত দিন! কলকাতা শহরও পোড়া দেশের বাইরে নয়। সেখানকার মানুষের কোন মূর্তি, তাই বা কে জানে! তার উপরে হল পার্ক স্ট্রীট জায়গা।

নরেশ বলে, দুর্বুদ্ধি। পার্ক স্ট্রীটে ছাড়া মেয়ে-হস্টেল নেই যেন আর!

অমলা বলে, কে ভাবতে পেরেছে, স্বাধীনতা মানে এমনি মাথা ভাঙাভাঙি? ঠাকুরপোকে লিখলাম খোঁজখবর করে হস্টেল থেকে লীলাকে সরিয়ে আনতে। মাকেও সকলে আমরা এত করে লিখলাম—

কথাবার্তা মাঝপথে থেমে যায়। বাইরের রাস্তায় গণ্ডগোল তুমুল হয়ে উঠেছে। অনেক মানুষের মিলিত হাহাকার। সন্তর্পণে জানলা খুলে দেখল, আগুন দিয়েছে অদূরের বস্তিতে। চারিদিক আলো-আলোময়। দিনমান হয়ে গিয়েছে।

লছমন সিং চেনা লোক, পাড়ার মধ্যে মুদিখানার দোকান। এদেরও জিনিসপত্র আসে লছমনের দোকান থেকে। দোকানে আগুন দিয়েছে। সর্বস্ব যায়। পাগলের মতো হয়ে লছমন বেরিয়ে পড়েছে। ফায়ার-ব্রিগেডে ফোন করবে—হয়তো বা সেইজন্য।

দুড়ুম—

অমলা হায় হায় করে ওঠে : দেখ দেখ, গুলি করল লছমনকে। পড়ে গেল রাস্তার উপর। উঃ—

নরেশ তিক্ত কণ্ঠে বলে, কারফিউ চলছে। পথে বেরুন বে-আইনি এখন।

কিন্তু আগুন দিয়ে গেল যখন কারফিউয়ের ভিতর? তখন কোথায় মিলিটারি মুখ লুকিয়ে ছিল?

গুলি চলছে এদিক-সেদিক। জানলার কবাট ভেজিয়ে ফাঁক দিয়ে এরা দেখছে। ঘরে থেকে নিশ্চিন্ত নয়—ঘরের ভিতরে গুলি এসেও মানুষ খুন হয়ে গিয়েছে। লছমন পড়েছে হাসপাতালের একেবারে সামনে। বউ কান্নাকাটি করছে, আরও সব চেঁচাচ্ছে। বেরিয়ে আসতে পারছে না, তাদেরও লছমনের দশা হবে। মরে নি লছমন, হাত-পা ছুঁড়ছে। হাসপাতাল থেকে কয়েক-পা পথ। কিন্তু কড়া আইন—চোখের উপরে দেখেও তাকে তুলে আনবার জো নেই। প্রাণ নিয়ে লোফালুফি—ডাংগুলি খেলার মতন। এই সস্তা জিনিসটা সম্পর্কে মানুষের আর কোন বিচার বিবেচনা দেখা যাচ্ছে না।

সকাল ছ'টায় কারফিউ অন্তে নরেশ লছমনের কাছে গেল। তখন কিছু করবার নেই। শেষ।

অমলা বিষম অস্থির : পালাতে হবে যেমন করে হোক। যদি কিছু না-ও হয়, ভয়ে ভয়ে ওরা মরে যাবে। ইরা-নীরার কী চেহারা হয়েছে দেখ না।

মেয়েদের সামনে কোন কথা তোলে না। হাসি ভুলে গিয়েছে ওরা দু-বোন। আগে বাড়িময় দুড়দাড় করে বেড়াত। শহরময় নীরার গানের সুখ্যাতি। ইরার তেমনি নাচের। অফিসার বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি থেকে নরেশের নিমন্ত্রণ আসত—বিশেষ ভাবে অনুরোধ থাকত মেয়ে দুটিকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য। যারা একবর্ণ বাংলা বোঝে না, নীরার মুখে বাংলা গান শুনে শতকণ্ঠে তারা তারিপ করত। মুগ্ধ হয়ে ইরার নাচ দেখত। সে এক দিন গিয়েছে। আর, এখন চেহারা

দেখ সেই. দুই মেয়ের। শুকনো মুখে বেড়ায়—খায় না, ঘুমোয় না। বেয়াড়া বয়সটাই মস্তবড় অপরাধ তাদের। বাপ-মার অশান্তির দুই কাঁটা—দিবারাত্রি খচখচ করে বেঁধে। ছেলে ছিল সকলের ছোট—দেবেশ। সেটা বসন্তে গিয়েছে, মা-শীতলা নিয়ে নিয়েছেন দু-বছর আগে। ভাগ্যিস গিয়েছে, নয় তো তাকে নিয়েও মুশকিল হত। মেয়ে দুটোও গেল না কেন? তা হলে নির্ঝঞ্ঝাট, পালাবার কোন দায় থাকত না। পালে পালে মানুষ মরছে—বেঁচে থাকার যে হাঙ্গামা, মরা অনেক সোজা তার চেয়ে। কিন্তু সোমত্ত মেয়ে তো সহজে মেরে ফেলে না। মরার বেশি অনেক কিছু ঘটে।

অমলা বলে, তোমার উপরওয়ালাদের বল। সরকারকে ধরে-পেড়ে যদি কোন রকম ব্যবস্থা হয়।

হবে ঘোড়ার ডিম। অমলা নরেশ দু-জনেই ভাল মতো জানে। বরঞ্চ ব্যবস্থা করছি বলে একেবারে হাতের মুঠোয় নিয়ে ফেলবে। পায়ের নিচের মাটিই তো নেই—কিসের তবে ভরসা? পুলিশে গুলি করে নিরীহের উপর। যেমন ঐ লছমনকে দেখা গেল চোখের সামনে। সরকারের মন্ত্রী নিজের জন্য বাড়তি পেট্রোল নিয়ে লুঠেরাদের দিয়ে দেয় ঘরে ঘরে আগুন দেবার জন্য। পেনাল-কোডের মতে খুন-রাহাজানি বড় অপরাধ, সে কেবল বইয়েরই লেখা। মুসলমানের কাছে তার চেয়ে অনেক বড় অপরাধ—হিন্দু বা শিখ হওয়া। মুসলমানও ঠিক সেই রকম হিন্দু-শিখের কাছে। মানুষ-বিচারের আজব রীতি এই বিশ শতকের মাঝামাঝি এসে।

মন ভাল নয়, মাঝে মাঝে নরেশ স্ত্রীর উপর খিঁচিয়ে ওঠে: দিব্যি ছিলাম কলকাতায়, নিজের বাড়ি মা-ভাইয়ের সঙ্গে থাকতাম। তোমার জেদে পড়ে পাণ্ডববর্জিত দেশে এসে এখন এই কাণ্ড। প্রাণ ক'টি ফিরিয়ে নিয়ে যাব, সে আশাও দেখতে পাই নে।

অমলারও বলার কথা আছে। কিন্তু কথা-কাটাকাটির সময় কি এখন? শুধু বলে, মা আলাদা করে দিলেন—আমার কথা ছেড়ে

দাও, নাতি-নাতনিদের অবধি। নিজের জায়গায় পর-অপরের মতন থাকা যায় কেমন করে? জেদ আমার আছে মানি। কিন্তু তিনি নিজের মা বলে সমস্ত দোষ একলা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিও না।

বলতে বলতে আকুল হয়ে কেঁদে ফেলেঃ তখন কি জানি এত শিগগির স্বাধীনতা আসবে? আর, স্বাধীনতার এই চেহারা? তা হলে শতেক লাঞ্ছনা সয়ে বাগবাজারে পড়ে থাকতাম।

দুই

নরেশের মা নবনলিনী শক্ত মেয়েমানুষ। স্বামীও ডাক্তার ছিলেন, সন্ন্যাস রোগে হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। কাঁধের উপর দুই অরক্ষণীয়া মেয়ে। নরেশ সবে মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছে, সুরেশ একেবারে শিশু। সহায়সম্বল কিছু নেই— বাগবাজার স্ট্রীটের উপর পুরানো দোতলা বাড়ি একখানা। অন্য কেউ হলে চোখে অন্ধকার দেখত। নবনলিনীকে একটিবার চেঁচিয়ে কাঁদতে কেউ দেখল না। ছেলেমেয়েরা তা হলে আরও অধীর হয়ে পড়বে। কান্নাকাটির অবসরই নেই যেন তাঁর।

বাপ যে ডাক্তারখানায় বসতেন, নরেশও সকাল বিকাল বসল সেখানে কিছুদিন। বাপের প্রাকটিশটা নিয়ে নেবে ভেবেছিল। কিন্তু রোগি উত্তরাধিকার সূত্রে আসে না, অল্প পয়সায় হলেও একেবারে টাটকা পাশ-করা ডাক্তারের কাছে প্রাণ সঁপে দিতে কেউ রাজি নয়। রাঘব-বোয়ালের মতো প্রবীণ ডাক্তাররা চতুর্দিকে, মৃত ডাক্তারের রোগিপত্তর নিজেদের মধ্যে সকলে ভাগাভাগি করে নিলেন। ফলে মাসের তিরিশ দিনে তিরিশটা টাকাও আসে না নরেশের পকেটে।

কিন্তু স্ত্রীলোক হয়ে নবনলিনী শুধুমাত্র নিজের চেষ্টায় যা করলেন, সেটা একেবারে তাজ্জব। কালাশৌচ পার হতে না হতে বড় মেয়ে বিভার বিয়ে দিয়ে ফেললেন। পাশ-টাশ না করলেও বিনোদ হেলাফেলার পাত্র নয়—চা-বাগানের বড়বাবু অর্থাৎ হেড-ক্লার্ক। সাহেবি কনসারন, মাইনে ভালই। তার উপরে, বিস্তর কুলি খাটাতে হয় সেই বাবদে দু-হাতে উপরি রোজগার। ছোট মেয়ে নিভারও সম্বন্ধ আসে। কিন্তু বড়র বিয়ের ধারদেনা কতকটা সামলে নিয়ে তবে এই কাজে নামবেন। নবনলিনীই তাই গড়িমসি করছেন।

চা-বাগানের কোয়ার্টারে স্ত্রীকে নিয়ে যাবে, বিনোদ সেই জন্য শ্বশুরবাড়ি এলো একবার। এসে দেখে অবস্থা। নরেশকে বলে, চাকরি করতে চান তো বলুন। এখনো সুবিধে আছে ও-তল্লাটে, কালাজ্বর ডেঙ্গুজ্বর ব্লাকওয়াটার ফিভার এসবের ভয়ে ভাল লোকে যেতে চায় না। তবে বেশি দিন আর নয়। পেটের ক্ষিধেয় মানুষের ভয় ভাঙছে, ভিড় জমে আসছে। শাশুড়িকেও বলে, স্বাধীন প্রাকটিশ জমানো অনেক কথার কথা। কত ডাক্তার আছে, চুল পেকে গিয়েও ডাল-ভাতের পয়সা জোটাতে পারে না। বড়দা'র জন্য বলেন তো চাকরির চেষ্টা দেখি। বাগানের সাহেব-ম্যানেজারের সঙ্গে খাতির আছে, তাকে বলে দেখব। ইচ্ছে করলে ওরা কিছু করে দিতে পারবে।

নবনলিনী ভেবেচিন্তে রাজি হলেন। অর্থের প্রয়োজন। বিভার বিয়ের দেনা আছে, ছোট মেয়েকেও তাড়াতাড়ি পাত্রস্থ করতে হবে। যাওয়ার সময় বিভাকেও বলে দিলেন জামাইকে মাঝে মাঝে যাতে মনে করিয়ে দেয়।

বিনোদ মিথ্যে আশা দেয় নি। মাসখানেকের মধ্যেই চিঠি দিল নরেশের যাবার জন্যে। ভগ্নিপতির বাসায় উঠে চাকরির দরখাস্ত লিখতে গিয়ে নরেশ অবাক: কী কাণ্ড! এত বড় চাকরি কেন দেবে আমায়? কোন-এক বাগানের ডাক্তার হলে আশা করা যেত।

বিনোদ বলে, কাছাকাছি সব বাগানে খোঁজখবর নিয়েছি। খালি নেই। বাগানের ডাক্তারির তো হাঙ্গামা নেই, যা-হোক একটা ডিপ্লোমা হলেই হল। হালফিল ঐ যে নানা কোম্পানি হয়েছে, দশটা টাকা দিলে ডিপ্লোমা ডাকে পাঠিয়ে দেয়, সেই রকম একখানা ছাপা কাগজ দেখালেই চাকরি।

পনের-বিশটা বাগানের ডাক্তারের মাথার উপর হল গ্রুপ মেডিকেল অফিসার। নরেশ বলে, নতুন ডাক্তার আমি, সামান্য অভিজ্ঞতা—আমায় কেন এ চাকরি দেবে?

বিনোদ বলে, নতুন বলে কথা নয়। ছ-ছ'টা বছর মুখে রক্ত তুলে পড়াশুনো করেছেন, এক-শ গণ্ডা মড়া কেটেছেন। এতদূর বিদ্যে নিয়ে কেউ বাগানে আসে না।

একটুখানি থেমে আবার বলে, নতুন বলে নয়, মুশকিল যা-কিছু কালা চামড়া নিয়ে। এসব চাকরি সাহেবেরা বরাবর পেয়ে আসছে। তবে আমাদের সাহেব কথা দিয়েছে—মেডিকেল কলেজের পাশ যখন, বোর্ডের অন্য সবাইকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঠাণ্ডা করা যাবে। ভাবনা কেবল দত্ত সাহেবকে নিয়ে। সে জায়গায় ধরাধরি চলে না, আর তিনি একবার 'না' বলে দিলে অন্য কারও কিছু করবার সাধ্য নেই।

দত্ত সাহেবের নাম সেই প্রথম শুনল নরেশ। মুসলমান—পুরো নাম কামালউদ্দিন দত্ত। বাপ কমলাচরণ দত্ত, আদিবাস নদীয়া জেলায়। চাকরি সূত্রে চা-বাগানের এলাকায় এসে শেষ পর্যন্ত তিনি মুসলমান হলেন। আগের স্ত্রী গত হয়েছিলেন—মুসলমান রীতিতে বিয়ে করলেন আবার। নামের বদল হয়ে গেল ওই সঙ্গে, শুধুমাত্র পৈতৃক দত্ত উপাধিটা নামের লেজুড় স্বরূপ রেখে দিলেন। সেই কমলাচরণের ছেলে কামালউদ্দিন। বাপের মতন কামালও নামের সঙ্গে দত্ত লেখেন, দত্ত সাহেব নামে তাঁর পরিচয়। গোটা চার-পাঁচ বাগানের মালিক হয়ে বসেছিলেন, বুড়া বয়সে কামাল

তার মধ্যে একটিমাত্র রেখে বাকি সব বিক্রি করে দিয়েছেন। ঝামেলা পোহাতে চান না বোধ হয়। প্লাণ্টার সবাই ইংরেজ, দেশি মানুষ একা ঐ দত্ত সাহেব। এ তল্লাটের সমস্ত চা সোজাসুজি লণ্ডনে চালান হয়ে যায়, সেখান থেকে দুনিয়ার অন্যান্য বাজারে। চায়ের বাজার দত্ত সাহেবের নখদর্পণে—বয়সকালে হামেশাই লণ্ডনে চলে গিয়ে হালচাল বুঝতেন। ইদানীং অনেক বছর যাওয়া বন্ধ। তা সত্ত্বেও চায়ের বাজারের ভবিষ্যৎ তেজি-মন্দা দৈবজ্ঞের মতো বলে দিতে পারেন। বোর্ডের মধ্যে তাঁর বড় খাতির, তাঁর উপরে কেউ কথা বলে না। বোর্ডের মীটিঙে তিনি যাতে হাজির হন, তার জন্য চিঠি-লেখালেখি আর অনুরোধ-উপরোধের অন্ত থাকে না।

ইণ্টারভিউ দিতে গিয়ে নরেশ সকলের মুখে তাকিয়ে দেখে। বাঙালি বলে কাউকে মনে হয় না, দত্ত সাহেব আসেন নি নাকি? বেয়াড়া মানুষটা না আসায় সোয়াস্তি পেল মনে মনে। দীর্ঘাকার এক ব্যক্তি ট্রপিক্যাল রোগপীড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। এই সমস্ত রোগই এ অঞ্চলে। ডাক্তার বলে মনে হয় মানুষটিকে। অগাধ জ্ঞান—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এত সব জিজ্ঞাসা করছেন, রীতিমত বিশেষজ্ঞ ছাড়া এমনটা সম্ভব নয়। তার পরে পারিবারিক কথাবার্তায় এলেন: সংসারে কে কে আছে—ইত্যাদি। অন্য সকলের দিকে চোখ ঘুরিয়ে একবার বললেন, কলকাতার লোকে আমাদের অঞ্চলটাকে নরককুণ্ড বলে মনে করে। বোর্ড যাকে কাজটা দেবে, সেই লোক দু-দিনেই পালাই-পালাই করবে না এ সম্বন্ধে আমাদের নিঃসংশয় হওয়া উচিত। হঠাৎ তিনি বাংলায় বললেন, তোমার পারিবারিক প্রসঙ্গ সকলের না শুনলেও চলবে। ইচ্ছা হলে বাংলায় জবাব দিতে পার।

তখন বুঝল দত্ত সাহেব এই। এত ফরসা যে চেহারায় ধরবার জো নেই। চাকরিটা হল। চা-বাগানের কাজে মাইনে

ভালই। নয় তো এত দূরের পাহাড়ে জঙ্গলে পড়ে থাকতে যাবে কেন মানুষ? নরেশের যা মাইনে, কোন নতুন ডাক্তার তা স্বপ্নে ভাবতে পারে না। কোয়ার্টারও চমৎকার। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে নবনলিনী খুব কষ্ট করে চালাচ্ছেন—নিচের তলায় খান তিনেক ঘর রেখে সমস্ত বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন। এবার পরমোল্লাসে নরেশ মাকে লিখল: এই আমার মাইনে, তার উপরে প্রাইভেট প্রাকটিশ আছে। নিভার বিয়ের পাকাপাকি করে ফেল মা, বোশেখমাসে হবে। আর ভাড়াটে তুলে দিয়ে হাত-পা মেলে থাক এবারে তোমরা। উত্তরে নবনলিনী লিখলেন, অতগুলো ঘরে কি হবে? সাফসাফাই রাখতেও হাঙ্গামা। আমার বউমা আসুক, সেই সময় ভাড়াটে তুলব। বোশেখে নিভার বিয়ে যদি হয়, পাড়ার মেয়ে-ইস্কুলে তখন গ্রীষ্মের ছুটি—সেই বাড়ি পাওয়া যাবে। অসুবিধা হবে না।

মোটর-সাইকেলে চেপে নরেশ এ-বাগানে ও-বাগানে ঘোরাফেরা করে। বাগানের আলাদা ডাক্তার ও ডাক্তারখানা ছাড়া সবগুলো বাগানের সাধারণ হাসপাতাল। সেই হাসপাতালের মাথার উপরেও নরেশ। সোনাটিকারি-বাগান দত্ত সাহেবের। বাগানেই থাকেন তিনি বারো মাস। ফ্যাক্টরি ও অফিসের হৈ-চৈ থেকে অনেকটা দূরে বাগানের একেবারে ভিন্ন প্রান্তে পুরানো গাছপালার ছায়ান্ধকার, দীর্ঘ ইউক্যালিপটাস কতকগুলো মাথা তুলে আছে, তার ভিতরে পাঁচিল-ঘেরা পাকা কুঠি। অজস্র ফুল, ইউক্যালিপটাসের দীর্ঘ গুঁড়ির গায়েও অর্কিড বসিয়ে ফুল ফুটানো হয়েছে। এত বড় কুঠিতে থাকবার মানুষ একলা দত্ত সাহেব। চাকর-বাকর ছাড়া বাইরের কোন লোক কুঠিতে যায় না, দত্ত সাহেব দেখা করেন না। যত-কিছু কাজকর্ম চিঠির মারফতে। অথবা দরকার হলে তিনিই যাবেন অন্যত্র। তা-ও কালে-ভদ্রে কদাচিৎ। পারতপক্ষে

ঐ রুদ্ধদ্বার কুঠি ছেড়ে তিনি নড়তে চান না। নানান রহস্যময় রটনা তাঁকে ঘিরে। এমন কি ভূতের বাড়ি বলে নাম আছে তাঁর কুঠির। দত্ত সাহেবের স্ত্রী আর মেয়ে একই দিনে কলেরায় মারা যায় ঐ কুঠি-বাড়িতে। তার পরে পুরোপুরি পাগল হয়ে যান তিনি। চিকিৎসা হয়েছে, কিন্তু লোকে বলে কিছু ছিট রয়েছে এখনো। শোবার ঘরের লাগোয়া স্ত্রী-কন্যার কবর—দত্ত সাহেব নাকি জানলা খুলে রেখে সারা রাত গল্পগুজব করেন। দিনমানেও অনেক সময় গিয়ে বসেন শীতল ছায়াচ্ছন্ন কবরের পাশে; মাটির উপরতলা আর নিচের তলায় কথাবার্তা চলে। লোকে বলে বেড়ায় এই সমস্ত। কুঠি-বাড়ি সত্যি এমন নিঝুম যে পাশের রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দেহ যেন হিম হয়ে আসে। নরেশের অন্তত তেমনি এক অনুভূতি হয়েছিল। মোটর-সাইকেলের ভটভট আওয়াজ তুলে সঙ্কোচ হত ওখান দিয়ে যেতে। ভয় হত। ঐ পথে যাবার প্রয়োজন থাকলে সে বাইসাইকেল নিয়ে বেরুত।

একদিন যেতে যেতে নরেশ গান শুনতে পেল। কুঠি-বাড়ির দেয়ালের অন্তরাল থেকে গান আসছে। সাইকেল থেকে নেমে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। আশ্চর্য, কানে শুনেও তো বিশ্বাস হওয়া শক্ত। সোনাটিকারি-বাগানের কুলি-লাইনে একটা জরুরি কেস, কিন্তু কর্তব্য ভুলে সে দাঁড়িয়ে রইল। এতগুলো বাগানের এত মানুষজন—গান তো কতই শুনে থাকে, কিন্তু এ বস্তু একেবারে আলাদা। সুরে নেশা ধরিয়ে দেয়। কে যেন সেই রাস্তার উপরে খোঁটা পুঁতে নরেশের পা দুটো শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে। শেষ হয়ে যাবার পর তবে সে নড়তে পারে।

সোনাটিকারি-অফিসে খবর নিল, মেয়েটা দত্ত সাহেবের ভাইঝি। সাহেবের কোন ভাই আছে, কস্মিন কালে কেউ জানে না। আছে নিশ্চয়, নয় তো ভাইয়ের মেয়ে আসে কেমন করে? হাসপাতালের ইন-চার্জ ডাক্তারটি ক্যাম্বেল ইস্কুলের পাশ-করা, পুরানো লোক।

ক'দিন পরে তাঁর কাছেও কিছু শোনা গেল। মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর। অমলা নাম। ইদানীং দত্ত সাহেবের শরীরটা ভেঙে পড়েছে। হাঁপানি-কাশি—আশ্বিন থেকে কয়েকটা মাস এখন শয্যাশায়ী হয়ে আছেন একেবারে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অপটু হয়ে পড়ছেন। অমলা বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনো করত। পড়ায় বোধ হয় ইতি দিয়ে চলে এসেছে। থাকবে আশাতত কিছুদিন, চাচা সাহেবকে দেখাশুনা করবে।

ঐ পথে যাবার সময় কুঠি-বাড়ির সামনেটায় এসে নরেশ সাইকেল থেকে নেমে পড়ে। উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ক্ষণকাল। কিছু না, নিরালা কুঠি-বাড়ি যেমন কে তেমন। চলে গেল নাকি অমলা, হয়ে গেল চাচা সাহেবের দেখাশুনা? কিম্বা গান গাওয়ার সময় হয়তো আলাদা। নরেশের অবিশ্রান্ত কাজকর্ম—গানের লোভে এই রাস্তায় যখন-তখন এসে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

তার পরে আকস্মিক ভাবে দেখা হয়ে গেল সেই অমলার সঙ্গে। দেখল তাকে অর্ধ-অচেতন অবস্থায় হাসপাতালের অপারেশন-টেবিলের উপরে। টনসিলের দোষে গান গাওয়া প্রায় বন্ধ; পেকে ওঠে মাঝে মাঝে খুব কষ্ট দেয়। অথচ চাচা সাহেবকে এই অবস্থায় রেখে বাইরে কোথাও যেতে পারছে না। অমলা তাই হাসপাতালের ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছিল, এইখানে টনসিল অপারেশন সম্ভব কি না? ডাক্তারবাবু উৎসাহ দিয়েছিলেন: এ আর কী! ফোড়া কাটার চেয়ে বেশি কিছু নয়। আখচার লোকে এসে কেটে যায়, কত লোকে এমনি শখ করেও কাটে।

দু-চারদিন এমনি কথাবার্তা হল অমলার সঙ্গে। ডাক্তারবাবু খুব আগ্রহ দেখাতেন: আমাদের হাসপাতালের মতন সাজসরঞ্জাম শহরের বড় বড় হাসপাতালেও নেই। কেন মিছে কষ্ট পাও মা, খুব বেশি তো আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে আরোগ্য করে ছেড়ে দেব।

নরেশ এসব জানে না। কত রোগি আসে, সব-কিছু তাকে

জানাতে হবে এমন বিধি নয়। ভাইঝির অপারেশন করে দত্ত সাহেবের অনুগ্রহ-দৃষ্টি নেবেন, তার মধ্যে অন্য কেউ ঢুকে পড়ে বাহাদুরির বখরা নেবে—এটা মোটেই ইচ্ছা নয় ডাক্তারবাবুর।

দত্ত সাহেবের ভাইঝি বলে ডাক্তার অতিরিক্ত সতর্ক হয়েছিলেন, আর বোধকরি সেই জন্যেই গোলমাল ঘটে গেল। ঠিক-দুপুরে নরেশের কাছে খবর এলো রক্ত বন্ধ হচ্ছে না কিছুতে। ছুটল নরেশ। ফরসেপস দিয়ে ক্ষতমুখ চেপে ধরে রোগিনীর পাশে বসে আছে সে। ইনজেকসন চলছে। বাঁ-হাতে দু-খানা বিস্কুট তুলে মুখে দেবে, এইটুকু সময়ও হল না—বসে আছে নরেশ এক ঠায়। অসাধ্য কর্ম কিছু নয়, নরেশ না গেলে হাসপাতালের ডাক্তারবাবুই তো করতেন এ-সব। তবু তাঁর হাতে মুহূর্তের জন্য ফরসেপস ছেড়ে দিল না। খবর পেয়ে দত্ত সাহেবও হন্তদন্ত হয়ে চলে এসেছেন। এসে চুপচাপ বসে পড়েছেন একটা চেয়ারে।

বছরখানেক পরে নিভার বিয়ের সময় নরেশ বিনোদ বিভা সকলে কলকাতায় এসেছে। কাজকর্ম চুকে গেল। তখন বিনোদ একদিন শাশুড়ির কাছে কথাটা পাড়ে: অমলা মেয়েটির সঙ্গে নরেশের বিয়ে দিয়ে দিন।

নবনলিনী বিভার কাছে ইতিপূর্বে শুনেছেন। ঘাড় নেড়ে তিনি বললেন, দত্ত সাহেবের ভাইঝির সঙ্গে? সে হয় না। আমার বাড়িতে লক্ষ্মী-জনার্দন রয়েছেন, বউ এনে এখানে তুলব কেমন করে?

বিনোদের বড় ইচ্ছা, দত্ত সাহেবের সঙ্গে কুটুম্বিতা হয়। তাতে নানান সুবিধা। নিজের চাকরির ব্যাপারেও খানিকটা সুবিধা হবে। শাশুড়িকে সে নানা রকমে বুঝিয়েছে। মুসলমান হয়ে যাবার ঘটনাও আদ্যোপান্ত বলেছে তাঁকে। বিনোদ আগে জানত না, অমলার কাছ থেকে শুনে নিয়েছে। একটা বাচ্চা ছেলে রেখে কমলাচরণের

পরিবার অল্প বয়সে গত হলেন। ছেলেটাকে শাশুড়ির কাছে রেখে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। ঘুরতে ঘুরতে শেষে ওই সোনাটিকারির চা-বাগানে। এবং হতে হতে একেবারে ম্যানেজার। মালিকের সুনজরে পড়েছেন। মালিক মুসলমান—কমলাচরণও মুসলমান হয়ে তাঁর মেয়ে বিয়ে করলেন। এবং শ্বশুরের এন্তেকালের পর সোনাটিকারি ও অন্য চারটে বাগানের মালিক হয়ে বসলেন। আগের পক্ষের ছেলে কমলনয়ন দেশেঘরে থেকে বিষয়ভোগ করেন। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে ভদ্রলোকের, সকলের বড় অমলা। আর এই বুড়া বয়সেও আবার মেয়ে হয়েছে একটা। এই তো অবস্থা। দিনকাল খারাপ—পৈতৃক জমিজমা নেড়েচেড়ে দিন চালানো যায় না। দুরবস্থায় পড়ে কমলনয়ন চিঠিপত্রে যোগাযোগ করেছিলেন দত্ত সাহেবের সঙ্গে। দত্তেরও কেউ কোথাও নেই—বৈমাত্রেয় ভাইকে তিনি মাসে মাসে টাকা পাঠান। অমলাকে কলকাতার বোর্ডিং-এ রেখে পড়াচ্ছিলেন।

সমস্ত কথা বলে বিনোদ জোর দিয়ে বলল, তবে তো দেখতে পাচ্ছেন মা—মেয়ের আপন কাকা নয়, বৈমাত্রেয় সম্বন্ধ। অমলার বাপ হিন্দু, নিখুঁত ষোলআনা হিন্দু। অভাবে পড়ে টাকাকড়ি নিয়ে থাকেন কিছু-কিছু, তা বলে বড়লোক দত্ত সাহেবের বাড়ি পাত পাততে আসেন নি একটা দিনের তরেও। চোখের দেখাও হয় নি।

বিভাও বলেছে, জেদ কোরো না মা। অমলা মেয়েটা বড্ড ভাল। দাদারও মন পড়েছে। দাদা অবিশ্যি মরে গেলেও তোমার কথার অবাধ্য হবে না। কিন্তু অন্য কোথাও বিয়ে দিলে কোন দিন ওর সুখশান্তি হবে না। আমি তোমায় সত্যি কথা বলছি মা।

জামাই ও মেয়ের কথায় নবনলিনী স্পষ্টাস্পষ্টি কোন জবাব দিলেন না। কাটল কয়েকটা দিন। ছুটি ফুরিয়েছে, বিনোদরা

সবাই চলে যাবে এইবার। পাশাপাশি সকলে খেতে বসেছে। ভাত দিয়ে নবনলিনী সামনে এসে বসলেন। নরেশকে বললেন, বিনোদের কথা শুনলাম, বিভার কথাও শুনলাম—কিন্তু তোর মুখে তো কিছু শুনতে পেলাম না বাবা। তোর কি ইচ্ছে?

নরেশ মৃদু কণ্ঠে বলে, তোমার যা ইচ্ছে তাই হবে।

নবনলিনী সায় দিয়ে বললেন, সে তো হবেই। কিন্তু তোর কথাটাও শুনতে চাচ্ছি আমি। খুলে বল।

নরেশ ইতস্তত করে বলে, চাকরির কিছু সুবিধা হত—

ভগ্নিপতির দিকে চেয়ে বলল, হার্বার্ট সাহেব কি রকম আমার পিছু লেগেছে, সে-সমস্ত বলেছ মাকে?

তখন প্রসঙ্গটা বিনোদের মনে পড়ে যায়: মেডিকেল অফিসারের চাকরিটা বরাবর বিলাতি সাহেবেরা করে এসেছে। দেশি মানুষ হয়েও বড়-দা কাজটা পেলেন দত্ত সাহেবের জন্য। সাহেবগুলো মোটেই খুশি নয়, একটা কোন অজুহাত পেলে বড়-দাকে সরিয়ে দেবে। সেই মতলবে আছে।

নরেশ বলে, বিলাতের মানুষ না হলাম, বিলাতি একটা ডিগ্রি হলে ওদের মুখ বন্ধ হবে। দত্ত সাহেব তাই বলছেন লণ্ডনের ডি. টি. এম. হয়ে আসতে। ওঁর বিস্তর বন্ধুবান্ধব সেখানে, অসুবিধা হবে না। খরচপত্র উনি সমস্ত দিতে চান।

নবনলিনীর মুখে হঠাৎ অন্য কথা: পায়েসটা কেমন হয়েছে রে?

বিভা বলে, মিষ্টি দিতে ভুলে গিয়েছ তুমি মা।

ব্রহ্মার ঘৃত-পায়স, মিষ্টি দিতে নেই। কিন্তু খেতে কেমন হয়েছে তাই বল না।

চেটেমুছে খেয়ে বিভা বললে, খাসা।

বিনোদ বলে, একটুকরো পাটালি ভেঙে দিন মা। মেখে নিই। আরও ভাল লাগবে।

উঁহু, সে হবার জো নেই। পাটালি আলাদা খাবে। এর সঙ্গে মেশানো চলবে না।

এই খাওয়ার কথাই চলল অতঃপর। বিয়ের কথা—রওনা হয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই সময়টা। নবনলিনী মত দিয়ে দিলেন। জামাইকে ডেকে বললেন, তোমাদের সকলের পছন্দ, সে জায়গায় আমার কিছু বলবার নেই। কথাবার্তা পাকা করে দিন ঠিক করে ফেল। মেয়ে ওঁরা কলকাতায় নিয়ে আসুন। আত্মীয়-কুটুম্বরা বরযাত্রী যাবে, আমোদ-আহ্লাদ করবে। কলকাতায় বিয়ে না হলে সেটা হবে না। সেইটে বোলো বুঝিয়ে। তবে একটা কথা—

থামলেন একটুখানি: একটা সর্তে আমি মত দিচ্ছি। কোন বাবদে সিকি পয়সা নিতে পারবে না দত্ত সাহেবের কাছ থেকে। চাকরি তাতে থাক আর যাক।

বিনোদ মিনমিন করে বলে, একটা বিলাতি ছাপ থাকলে কিন্তু ভাল হত মা।

নবনলিনী বলেন, মেয়ের ঠাকুরদাদা ধর্ম ছাড়লেন পাওনা-গণ্ডার লোভে। পিতৃপুরুষের ধর্ম সমাজ-সামাজিকতা আর মা-মরা ছেলে ফেলে জঙ্গলরাজ্যে গিয়ে বড়লোক হলেন। স্বার্থসিদ্ধির মতলব নিয়ে নরেশ বিয়ে করবে, আমি তা চাই নে।

অলঙ্ঘ্য এ হুকুম। নরেশ সোজা গিয়ে দত্ত সাহেবকে বলল, আপনার ইচ্ছা রাখা সম্ভব হবে না। ট্রপিক্যাল রোগপীড়া আমাদেরই দেশের। যা-কিছু শেখবার, রোগি দেখে দেখে আর বই পড়ে দেশে থেকে শিখতে পারব। শেখবার জায়গাই হল এদেশ। সাগর পার হয়ে গিয়ে সেখান থেকে ডিগ্রি আনার মানে হয় না।

বিয়ে হল। কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে অমলার বাপ-মা এসে বিয়ে দিয়ে গেলেন। খরচপত্র নিশ্চয় দত্ত সাহেবের। এত মানুষ জমল, কিন্তু তাঁর কেউ ছায়া দেখতে পেল না।

বিয়ের পরে অমলা বউ হয়ে বাগবাজারের বাড়ি এল। তার পরেও এসেছে বার দুয়েক। সমাদরে নিয়েছেন নবনলিনী। অতি-সন্ধানী নজরও ধরতে পারবে না, এই বউ ঘরে আনতে নবনলিনীর গোড়ায় আপত্তি ছিল। তবে ঠাকুরঘরের ধারে-কাছে যায় না অমলা। বউ ঠাকুরঘরে ঢুকে ঠাকুর-সেবায় লেগে পড়লে নবনলিনী কি করতেন, বোঝা গেল না অতএব। সেই প্রথম দিনের কথাবার্তা মনে করে নরেশই হয়তো অমলাকে মানা করে দিয়েছে।

রান্নাবান্না সেরে সকলকে খাইয়ে দিয়ে নবনলিনী গঙ্গাস্নানে যেতেন। আড়াই প্রহর বেলায় ফিরে এসে ভাতে-ভাত চাপাতেন নিজের জন্য। নরেশকে অমলা ঝাঁজের সঙ্গে বলে, জানি, জানি—মেথর-মুদ্দফরাস আমি, সেই জন্যে। কলাপাতার উপর চাট্টি ভাত দিয়ে কলতলার দিকে রেখে এলে তো পারেন, ঐখানে বসে খেয়ে নিই। তা হলে আর অবেলায় ওঁকে চান করে মরতে হয় না।

নরেশ বলে, অন্যায় রাগ করছ, তোমার ব্যাপার কিছু নয়। বিধবা শুদ্ধাচারী মানুষ—মাছ রান্না হয়, সেইজন্যে চান করেন।

ঘাড় নেড়ে অবিশ্বাসের সুরে অমলা বলে, আমিও পাড়াগাঁয়ে থেকে এসেছি। বিধবা মানুষ অনেক দেখা আছে আমার।

নরেশ বলে, সে কথা ঠিক, মার কিছু বাড়াবাড়ি আছে। বেশি রকমের শুচিবেয়ে। কিন্তু মা যে! উনি আমাদের বকবেন, গালিগালাজ করবেন। কিন্তু ওঁর সম্বন্ধে আলোচনা চলবে না তো!

সে যাই হোক, দশ-বিশ দিনের ব্যাপার। তার পরেই চলে যাবে আবার চা-বাগানে। নতুন বউ বলে অমলার যত-কিছু রাগারাগি নরেশের সঙ্গে। চাপা গলায় রাগ করে, অন্য কারো কানে না যায়। নরেশও বোঝায়: ক'টা দিনই বা আছ, মুখ বুজে চুপচাপ কাটিয়ে যাও। অমলাও বুঝে নিল তাই। বাইরের হাসি-খুশি দেখে কে বলবে, ভিতরে ভিতরে সে এত গরম! শাশুড়ির

ওদিকটা পারতপক্ষে ঘেঁষে না—কোন কাজে কখন অনাচার ঘটিয়ে বসে কে জানে! ছেলেমানুষ সুরেশটাকে সাধ হয় কোলে-পিঠে করতে, ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে কচি মুখের কাকলী শুনতে। বাইরের কুটুম্ব-মেয়েরা এসেছে, তারা সব ফুটফুটে ছোট ছেলেটা নিয়ে লোফালুফি করে। অমলা ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে থাকে। নবনলিনীর শুচি সংসারের মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ তার। শিরিষ-গাছের ছায়ার নিচে দিগ্‌ব্যাপ্ত বেঁটে বেঁটে চায়ের গাছ, তাদেরই সে চেনে বোঝে এখন। কয়েকটা দিন কোন গতিকে বাগবাজারে শ্বশুরবাড়ি কাটিয়ে আবার চায়ের এলাকায় পৌঁছে অমলা বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচল।

অমলার সেই প্রথম শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাকা। চা-বাগানের মধ্যে তেরো চোদ্দটা বছর তারপরে যেন পাখনা মেলে উড়ে পালাল। ইরা-নীরার জন্ম হল—এবং দুই মেয়ের অনেক বছর পরে ছেলে দেবেশ। নরেশ কাজকর্মে মাঝে মাঝে কলকাতায় যায়, মা-ভাইকে দেখে আসে। রান্নাঘরের মেজেয় সে আর সুরেশ পিঁড়ির উপর পাশাপাশি বসে মায়ের রান্না খায়। অমলা চিঠিপত্র লেখে। ইরা-নীরাও লিখতে শিখে ঠাকুরমা আর কাকামণির নামে চিঠি লিখে মায়ের খামের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়।

লড়াই বেধে গেছে ইতিমধ্যে। বর্মা জাপানিদের দখলে। দ্রুত আসছে তারা এদিকে। মানুষ দিশাহারা হয়ে পালাচ্ছে। নানান গুজব। এসে পড়ল বলে, কী হবে না জানি তখন অবস্থা! এমনি যত না ভয়, ডিফেন্সের নামে নানারূপ উৎকট ব্যবস্থা করে ও আজগুবি কথাবার্তা শুনিয়ে আরও ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে মানুষের। শুধুমাত্র প্রাণটুকু নিয়ে হাঁটাপথে পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে এসে পড়ছে অনেকে। এই সব দেখে-শুনেও আতঙ্ক।

দত্ত সাহেব আরও বুড়িয়ে গেছেন, শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। আগে আশ্বিন থেকে শুরু করে শীতের মাসগুলো

ভুগতেন, এখন বারোমাস তিরিশ দিন। ভোগান্তির শেষ নেই—সর্বক্ষণের নার্স চাই। অমলা যথাসাধ্য করে, কিন্তু সংসার আর ছেলেপুলের ঝামেলা কাটিয়ে খুব বেশি সম্ভব হয় না তার পক্ষে। জঙ্গল-রাজ্যে ভাল নার্স পাওয়া দুর্ঘট। টাকার লোভে এলেও দু'দিন পরে যাই-যাই করে। এমনি অবস্থায় পড়ে সর্বশেষ সোনাটিকারি টি-স্টেটও দত্ত সাহেব বিক্রি করে দিলেন। স্ত্রী আর ছেলের দেহ-কঙ্কাল দুটো দূর-ভূমিতে মাটির নিচে রেখে কলকাতায় বেনেপুকুরের একটা বাড়িতে গিয়ে উঠলেন তিনি। অমলাই ঠেলেঠুলে পাঠাল, নইলে হয়তো বেঘোরে মারা পড়বেন কোন একদিন।

চাচা সাহেবকে পাঠিয়ে দিয়ে তারপরে নিজেরাও পালাবার চেষ্টায় আছে। দরখাস্তের পর দরখাস্ত ছাড়ছে নরেশ। হয়েও গেল চাকরি—চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ট্রপিক্যাল রোগপীড়ার জুনিয়ার ফিজিসিয়ান। মাইনে অনেক কম চা-বাগানের চেয়ে। তা হোক—মা-ভাই থেকে তফাৎ হয়ে ছিল, নিজের বাড়িতে সকলে একসঙ্গে থাকবে এবার। মায়ের হাতে যে ক'টা টাকা এনে দেবে, তাতেই তিনি সুচারুভাবে চালিয়ে নেবেন।

কিন্তু কলকাতাই বা কি! এসে তারা অবাক। সারা বেলান্ত রাস্তায় হেঁটে বড় জোর বিশ-তিরিশটা মানুষের দেখা মেলে। সন্ধ্যা হতে না হতেই ব্লাকআউটের শহর একেবারে নিঃসাড়। সুরেশ ইতিমধ্যে কলেজে ঢুকেছে, কলেজের একটানা ছুটি। ইরা-নীরা পড়বে, কিন্তু কোন ইস্কুল খোলা নেই। এক মাস্টারমশায় বাড়ি এসে পড়িয়ে যান। তাই বা ক'দিন? মাস্টারমশায় পালাই-পালাই করছেন। মানুষের সোয়াস্তি নেই কোথাও। ধড়ের উপর মাথাটা বজায় রাখা সুসভ্য সমাজে অতি-বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে একটা সুবিধা বাগবাজারের বাড়ির উপরতলাটা ভাড়া দেওয়া ছিল—ভাড়াটে সরে পড়েছে। স্বামী মারা যাবার পরেই নবনলিনী ভাড়া

দিয়েছিলেন। ভাড়াটে আপোষে না গেলে জায়গার জন্য মুশকিল হত।

তবু কিন্তু মুশকিল ঘটল। একেবারে ভিন্ন দিক দিয়ে। ঘটালেন দত্ত সাহেব। সোজা মানুষ, চিরকাল বাইরে বাইরে কাটিয়েছেন, মাথায় তাঁর ঘোরপ্যাঁচ খেলে না। অমলারা কলকাতায় এসেছে, জানতে পেলেন। অমলা এখনো খবর দিতে পারে নি, চা-অঞ্চলেরই কেউ লিখে থাকবে তাঁকে। বাগবাজারের বাড়ির ঠিকানাও জানা আছে অমলার বিয়ের সময় থেকে। দুপুরবেলা একদিন মস্তবড় মোটরগাড়ি বাড়ির দরজায়।

ইরা-নীরা-দেবু, কোথায় সব তোরা? আমি এসেছি।

দেবেশ গিয়েছে সুরেশের সঙ্গে মিউসিয়ামে। ইরা-নীরাকেও বলেছিল, তারা যায় নি। না কাকামণি, ভিতরে খড়-পোরা মরা জানোয়ারের কি দেখব? চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে তো চল। কাকার সঙ্গে না বেরিয়ে দু-বোনে বাড়িতে রয়ে গেছে।

রাস্তার দরজা থেকে ডাক আসে, কোথায় রে?

গলা পেয়ে ছুটোছুটি করে দু-বোনে বেরুল। দত্ত সাহেবের দু-হাত দু-দিক দিয়ে জড়িয়ে ধরে বাইরের ঘরে এনে বসাল। আবার ছুটেছে উপরে অমলার কাছে। বোধকরি একটুখানি তন্দ্রা এসেছিল অমলার—

মা, ও-মা, দেখ উঠে কে এসেছেন। কাকামণির সঙ্গে না গিয়ে ভাল করেছি মা। দাদু এসে গেছেন।

দত্ত সাহেব কৈফিয়ৎ দেন: কোন কাজে এইদিকে এসেছিলেন, গাড়িটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন। শহরের একেবারে উত্তর অঞ্চলে কী এমন জরুরি কাজ, যার জন্য রুগ্ন অশক্তদেহ বৃদ্ধকে ঠিক দুপুরে বেরিয়ে পড়তে হয়—এই প্রশ্নে আমতা-আমতা করেন তিনি। হাসেন। আর ইরা-নীরার দিকে তাকিয়ে বলেন, আছে রে নানান ব্যাপার। সে তুই কি বুঝবি অমলা?

অমলারও হাসি পায়: বুঝি বই কি চাচা। বড় হয়ে গেছি যে, ছেলেপুলের মা হয়েছি। বাগবাজারে তোমার কাজের ব্যাপার এখন কেন বুঝব না?

নাতনি দুটির সঙ্গে বড় ভাব বুড়া কামালউদ্দিন দত্তের। অমলা কিম্বা দেবুকে নিয়ে অত দূর নয়। যখন চা-বাগানে ছিলেন, দিনান্তে একটিবার দেখা হওয়া চাই। এরা যাবে তাঁর সোনাটিকারির বাংলোয়, নয় তো নিজে তিনি চলে আসবেন। কলকাতায় ক'দিন মাত্র এসেছে—টের পেয়ে এই দেখ, অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে চলে এসেছেন।

দত্ত সাহেব বলেন, তোর শাশুড়ির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দে অমলা।

উনি ঘুমুচ্ছেন এখন।

মিছে কথা। নবনলিনী দুপুরে ঘুমোন না, সকলে জানে। কোন অবস্থায় কখনো ঘুমোন নি। নিজের ঘরে বসে কাঁথা সেলাই করেন। প্রয়োজনে নয়—এটা শিল্পকর্ম, ছোট বয়স থেকে এই অভ্যাস। নানা রঙের পাড়ের সূতায় কাঁথার উপর রকমারি ছবি তোলেন। বিয়ের বর যাচ্ছে পালকি চড়ে বরযাত্রী ও বাজনদার সঙ্গে নিয়ে। হাতির উপর থেকে বন্দুকধারী শিকারি গভীর জঙ্গলে বাঘের উপর তাক করেছে। এমনি নানান সব ছবি। নয় তো গুণগুণিয়ে মহাভারত পাঠ করেন এক-এক দিন। আজকে সাড়াশব্দ নেই, অতএব কাঁথা সেলাইয়ে ঝুঁকে পড়েছেন। ভাল হল, দত্ত সাহেবের কথা টের পাবেন না। ডাকাডাকি করে অমলা তাঁর কাছে জানান দিতে চায় না—সেইজন্যে মিথ্যে করে বসল, ঘুমুচ্ছেন শাশুড়ি।

চা করে আনি চাচা?

এই একটা নেশা দত্ত সাহেবের। যত বার দেবে, আপত্তি নেই। চা-বাগানে বসবাস করে এটা হয়েছে। দেড়-ঘণ্টা দু-ঘণ্টার

মধ্যে অন্তত একটি কাপ না পেলে গলা শুকিয়ে ওঠে তাঁর। ছাতের উপর চিলেকুঠুরিতে ভাড়াটের রান্নাঘর ছিল। দরকার মতন এটা-ওটা রেঁধে নেবে বলে স্টোভ রেখে দিয়েছে সেই ঘরে। টিপিটিপি উঠে গিয়ে অমলা স্টোভ ধরিয়ে চা তৈরি করল। উঠোন দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, নবনলিনী নিজের ঘর থেকে মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন, বউমা—

কাঁথার কাজেই তো আছেন, ঘাড় নিচু করে গভীর মনোযোগে পাড়ের সূতোর রঙ মেলাচ্ছেন। অমলা ঘরের বাইরে দাঁড়াতেই বললেন, কুটুম্বকে শুধু-চা দিও না বউমা। মিঞার হোটেলে অনেক রকম জিনিস পাওয়া যায়, কিছু আনিয়ে দাও ওখান থেকে।

যতটা মনে হয়, কাঁথা থেকে একটিবারও চোখ তোলেন নি। অথচ জানেন তিনি সমস্ত। বললেন, ওই ওদের কী সমস্ত খাবার—একটা কাগজে লিখে মধুকে পাঠিয়ে দাও। আমার নাম করে বল মধুকে। এনে দিয়ে তারপরে চান করে ফেলবে।

এই কথায় অমলা কঠিন হল। বলে, আমার চাচা নিরামিষ খান। মিঞার হোটেলের মাংসের খাবার চলবে না। শুধু চা-ই দিচ্ছি ওঁকে।

এর পরে দত্ত সাহেব আরও কয়েক বার এসেছেন। আসেন দুপুরের দিকে—হাঁপানির ব্যাধি বলে বিছানা থেকে উঠতেই দেড় প্রহর বেলা হয়ে যায়। অমলার নজরে পড়ল, ইরার কাপড়চোপড় ভিজে-ভিজে। মায়ের মেজাজ বুঝে কোন কথা ওরা খুলে বলতে চায়? অনেক প্রশ্নের পর বেরুল, ঠাকুরমা বাড়িময় গঙ্গাজল ছিটোন দত্ত সাহেব চলে যাবার পরে; ইরা-নীরা ও দেবুর সর্বাঙ্গে আচ্ছা করে ছিটিয়ে দেন। অমলার মনের মধ্যে রি-রি করে জ্বালা করে। তার চাচা কিসে নিচু এঁদের চেয়ে, কোন বিচারে?—যে গঙ্গাজল ছিটিয়ে পবিত্র হতে হবে চাচার ভালবাসার পাত্রদের?

নরেশকে বলে লাভ নেই। সে আছে রোগি আর হাসপাতাল নিয়ে। কানেই নেবে না। অথবা হাসবে। হেসে উঠে বলবে, বুড়োমানুষ—ওঁরা আর ক'দিন! তার পরেই তো আমাদের আমল। দেখ, যার মূলে কিছু নেই সে-বস্তু আপনি শুকিয়ে মরে যাবে। টানা-হেঁচড়া করে উপড়াতে যাওয়া মানে অকারণ উৎপাতের সৃষ্টি। সহ্য করে যাও, দেখো আপনাআপনি সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে।

বলবে, হিন্দু বল মুসলমান বল খ্রীষ্টান বল, সব ধর্মের ভিতরে গোঁড়ামি আছে। মানুষের চলাচল এতদিন গণ্ডির মধ্যে ছিল, জ্ঞানবুদ্ধি ছিল সঙ্কীর্ণ। তারই জের চলেছে। দুনিয়া এখন ছোট্ট হয়ে গেছে, মানুষ নানান সমাজের সংস্পর্শে আসছে, খোলা চোখে দৃষ্টি দিচ্ছে সকল দিকে। কোন চিন্তা নেই—সব মানুষ এক পরিবারের হয়ে উঠল বলে।

অথবা সোজাসুজি বলবে, আমার মা যে! সমালোচনার অতীত উনি। সহ্য করে যাও, তা ছাড়া উপায় দেখি নে।

নরেশকে নয়, মনের জ্বালা যে সুরেশের কাছে প্রকাশ করে বলল। সুরেশ বলে, ক'ফোঁটা জল গায়ে দিয়েছেন, ইরার তাতে সর্দি হবে না বউদি। ওই নিয়ে অত উত্তেজনা—তোমারই মাথায় কলসি কলসি জল ঢালা উচিত।

আমার চাচা সাহেবের অপমান—

কিন্তু চাচা তো জানতে পারছেন না।

আমি জানি—আমি ভাইঝি তাঁর, পর নই।

তুমি আমাদেরও লোক। যা-কিছু জান, সে কি বলতে যাবে চাচাকে? ইরা-নীরা যখন তখন ঠাকুরঘরে চলে যায়। যাবে তো বটেই, কেন যাবে না? ঠাকুরমার গায়ে গড়িয়ে পড়ে পাকাচুল তোলে, হাঁড়িকুড়ি হাতড়ে আমসত্ব চুরি করে খায়। চিরকাল ধরে মা মনের ভিতর সংস্কার পুষে এসেছেন—দু-ফোঁটা

জল ছিটিয়ে যদি তাঁর মনের ধোঁকা কেটে যায়, তাই নিয়ে অত রাগারাগি কেন বউদি ?

অমলা বলে, চাচা সাহেবকে বলে দিয়েছি, আর আসবেন না তিনি এ-বাড়ি। ছেলে-মেয়েরাও ওদিকে যাবে না, ওঁর লক্ষ্মী-জনার্দনের ছায়া মাড়াবে না।

সুরেশ সত্যি সত্যি ব্যথা পেয়েছে, মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। মুহূর্ত কাল চুপ করে থেকে বলল, দুই তরফের শাসনের কি দরকার ছিল ? চাচা না এলে তো ছেলে-মেয়ের গায়ে জল দেওয়ার কথাই ওঠে না। তবে কেন তারা ঠাকুরমার কাছে যাবে না ?

অমলা বলে, চাচা না এলেও ইরা-নীরা তাঁর বাসায় যাবে। চাচার কাছে ইংরেজি শিখতে যাবে। অমন ইংরেজি পড়াতে আর কেউ পারে না। পড়ার ব্যাপার না হলেও যেত তারা। এক শহরে বসবাস করে তারা দাদুর কাছে যেতে পারবে না, এটা বড় কঠিন অত্যাচার ঠাকুরপো।

সহসা সুরেশ হাতজোড় করে বলে, যা বলবে আস্তে বল বউদি। চাচার কানে তুলে তাঁকে কষ্ট দিয়েছ, আবার মায়ের কানে না যায়।

কিন্তু কানে হয়তো গিয়েছিল নবনলিনীর। অথবা ইরা-নীরা ঠাকুরমার ওদিকে যায় না, সেটা তিনি লক্ষ্য করে থাকবেন। একদিন দেখা গেল, মধুসূদন তেতলার চিলেকোঠা ধোয়া-মোছা করছে, ভাড়াটেদের ভাঙা উনুনে গোবর-মাটি দিয়ে নতুন ঝিক বসাচ্ছে।

নীরা জিজ্ঞাসা করে, কি হবে রে মধু ?

তোমাদের পেঁয়াজ-মাংস রান্না হবে এখানে। রান্নার আলাদা লোক আসবে।

সেইদিন নবনলিনী নরেশকে বললেন, একটা বাবুর্চি দেখেশুনে নিয়ে আয় বাবা।

নরেশ সবিস্ময়ে বলে, অবাক করলে যে মা! তোমার বাড়িতে মুসলমান বাবুর্চি, লক্ষ্মী-জনার্দন তাতে বেজার হবেন না?

নবনলিনী বলেন, ভাড়াটের জন্য আলাদা সিঁড়ি—বাবুর্চি সেই সিঁড়িতে ওঠা-নামা করবে। উঠোনের দিকে আসছে না, তবে আর ছোঁয়াছুঁয়ি হবে কিসে?

নরেশ বলে, সে যা-ই হোক আমি কিন্তু মা তোমার দিকে। রান্নাঘরে সুরেশের পাশাপাশি বসে তোমার রান্না ভাত-তরকারি খাব।

সুরেশ টিপ্পনী কাটে: গায়ে গঙ্গাজল ছিটোবেন কিন্তু মা—

নরেশ তার দিকে চেয়ে ক্রোধের ভান করে বলে, হুঁ, একা-একা এদ্দিন মায়ের প্রসাদ খেয়ে হিংসুটে হয়েছিস তুই। বাগড়া দিচ্ছিস। গঙ্গাজল ছিটোনোর কি ভয় দেখাস, গঙ্গায় ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়ে খেতে বসে যাব। মাগো, বিদেশ-বিভূঁয়ে পড়ে থেকে অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে হয়, তাই বলে বাড়িতেও?

একটা বাবুর্চি খুঁজেপেতে এনেছিল নরেশ। কিন্তু অমলা তাকে সোজা হাঁকিয়ে দিল: না, কোন দরকার নেই। ইরা-নীরা দেবু আর আমি—চারটে তো প্রাণী। রান্নার লোক লাগবে না।

মা-ই বলেছেন—

বলুন গে। তিনি বুড়োমানুষ রান্না করে নিজের ছেলেদের খাওয়াচ্ছেন তো আমিও পারব। হাতে আমার কুষ্ঠব্যাধি হয় নি। চিলেকোঠার রান্নাঘরে আমিই রান্নাবান্না করব।

আর, সেই লেগে গেল। অমলা সকালে রাত্রে নরেশকে অবিরত বলছে, মা আমাদের পৃথক করে দিয়েছেন। এক বাড়ির মধ্যে এমন থাকা যায় না। অন্য বাসা ভাড়া কর।

নরেশ ঝেড়ে ফেলে দেয়: অসম্ভব। এক কলকাতায় থাকব;

মায়ের সঙ্গে আলাদা হয়ে? আমার দ্বারা সে কাজ হবে না। লোকে কি বলবে?

অমলা আগুন হয়ে বলে, আমিও এক কলকাতার ভিতর আমার অমন চাচার সঙ্গে আলাদা হয়ে আছি, সেটা ভুলো না। থাক তোমরা, ছেলেমেয়ে নিয়ে আমিই চাচার বাসায় চলে যাই। ওদের হেনস্থা চোখের উপর দেখতে পারব না।

অহরহ এমনি খিচখিচ চলছে। অতিষ্ঠ হল নরেশ। হাসপাতালের কাজে আরও বেশি মনোযোগ দিয়েছে। দরকারের বেশি সময় পড়ে থাকে সেখানে। তারপরে এই চাকরি। লাহোরের কোন তেজভান সিং-এর নামে হাসপাতাল হচ্ছে, সর্বময় কর্তা হয়ে হাসপাতাল গড়ে তুলতে হবে। মাইনে রীতিমত মোটা অঙ্কের। চাকরিটা যেচে এসে পড়ল। পরে অবশ্য জানা গেছে, হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ধনী মিলওয়ালাটি হলেন কামালউদ্দিন দত্তের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিলাতে আলাপ-পরিচয়, মিলের যন্ত্রপাতি আনার ব্যাপারে দত্ত সাহেব খুব সুবিধা করে দিয়েছিলেন। চাচাকে বলে বলে অমলাই চাকরিটা জুটিয়েছে। চাকরি জুটিয়ে স্বামী ও সন্তানদের কলকাতা-ছাড়া করে নবনলিনীর উপর শোধ তুলল। বছর পাঁচেক কেটেও গেল চমৎকার। প্রচুর খাতির-সম্ভ্রম, কোনো দিক দিয়ে অভিযোগের কিছু নেই। কিন্তু এখন—কী সর্বনাশ! সেই যে নরেশ বলত দুনিয়ার মানুষের এক পরিবারস্থ হওয়া—এই তার লক্ষণ বুঝি! বেড়া আগুনের ভিতরে পালাবার পথ খুঁজছে—

মোটা লেফাপার মধ্যে একগাদা চিঠি চলে গেল কলকাতা বাগবাজারের ঠিকানায়। বাড়তি মাশুল দিয়ে পাঠিয়েছে।

নরেশ লিখেছে: মাগো, ভয়ে ভাবনায় অর্ধেক হয়ে গেছি। তোমার মনে ব্যথা দিয়ে এসেছিলাম, তার শাস্তি। সুযোগ পাওয়া মাত্র রওনা হয়ে পড়ব, একটা মিনিট দেরি করব না…

অমলা লিখেছে: পায়ের উপর গিয়ে পড়ব মা। লাথি মেরে কি সরিয়ে দেবেন আপনার অবোধ অবাধ্য মেয়েকে ?···

নীরা লিখেছে: দিদাভাই, ঠাকুরদেবতার গানও কয়েকটা শিখে নিয়েছি তোমায় শোনাব বলে। এখন তো একেবারে বাইরে যেতে পারি নে, ঘরের মধ্যে বসে দিনরাত গানের চর্চা করি···

ইরা লিখেছে: এত দিনে তোমার চুল আরও ঢের ঢের পেকে গিয়েছে। গিয়ে সব পাকাচুল সাফ করে দেব দিদাভাই। আর গোবর-গঙ্গাজল খেয়ে নেব, রান্নাঘরে ঢুকে তোমার জন্য যদি রাঁধতে দাও। কলকাতা ছেড়ে আর কোন দিন নড়ব না।···

দেবেশ নেই, ও-বছর বসন্তে মারা গেছে। থাকলে সে-ও লিখত এমনি-কিছু।

আর সুরেশকে অমলা আলাদা এক চিঠি দিয়েছে: আমার বোনটার খোঁজ নিও। অনেক দিন খবর পাই নে। পার্ক স্ট্রীটে উইমেনস হস্টেল—চিঠি পাওয়া মাত্র চলে যেও সেখানে। ওপাড়ায় থাকা বিপজ্জনক—হস্টেল ছাড়িয়ে নিয়ে এসো তাকে। মা'র যদি আপত্তি না থাকে, তোমাদের বাড়িতে এনো। তাহলে নির্ভাবনায় থাকব। নয়তো তোমাদেরই পাড়ায় কোন ভাল জায়গায় ব্যবস্থা করে দিও। বোন আমার বড় ভাল—আমার মতন একগুঁয়ে বদমেজাজি নয়···

দত্ত সাহেব নেই, থাকলে সেখানেও লিখত অমলা। এত জনে এমন করে লিখল, কিন্তু কই উত্তর আসে না তো! সেই রাগ পুষে রেখেছেন আজকের দিনেও ? কিম্বা, খবরের কাগজ তো বন্ধ—কলকাতা শহরই আছে কি না কে জানে!

তিন

আরও হপ্তাখানেক গেল লাহোর শহরে। আগে যা-হোক যৎসামান্য আবরু ছিল, সে বালাই চুকেছে। সৈন্যেরা দল বেঁধে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে রাস্তা দিয়ে চলে যায়। যত্রতত্র ছুঁড়ছে—যে দিকে যায় যাক, যার গায়ে লাগবার লাগুক। চলে গেল সৈন্যেরা। প্রায় তার পিছন ধরে বেরিয়েছে অন্য এক দল। পেট্রোল ও কেরোসিনের টিন হাতে হাতে। আর স্টিরাপ-পাম্প—লড়াইয়ের সময় এ. আর. পি. যা ঘরে ঘরে দিয়েছে। আগুন দিচ্ছে বাড়ি বাড়ি। আগুন ধরে গেলে বাড়ির লোক বেরিয়ে পড়ল, তখন যেমন খুশি মার ধর, লুটতরাজ কর। তেজভান হাসপাতালেও একদিন ঢুকে পড়ল। নিচের তলায় রোগিদের ঘরে ঘুরছে। দেখেশুনে বেরিয়ে চলে গেল। কী মতলব, কে জানে? কিন্তু এবার গিয়েছে বলে আর যে আসবে না, তার কোন মানে নেই। সেবারে উপরে উঠবে। কোলাপসিবল-গেটে তালা এঁটে কতক্ষণ ঠেকাবে?

নরেশ দুই মেয়ের হাত ধরে পাগলের মতো এঘর-ওঘর করছে। কী করি? যাই কোথায়? কোনখানে লুকোই গিয়ে?

আবদুল খাস বেহারা। মাঝবয়সি মানুষ—বয়সের হিসাবে বেমানান রকমের শৌখিন। বড় বড় চুল দু-ভাগ হয়ে গিয়ে কান ঢেকে থরে থরে কাঁধের উপর পড়েছে। অঙ্গে সর্বক্ষণ চেক-কাটা রঙিন মির্জাই। মেয়ে দুটোর সঙ্গে বেশি রকম মাখামাখির প্রয়াস। ফারাখ বিস্তর—হাসপাতালের তুচ্ছ এক চাকর, ও আর প্রচণ্ডপ্রতাপ ডাক্তার সাবের মেয়ে দুটি। আগে তাই এ সমস্ত নজরে পড়বার ব্যাপার ছিল না। ইদানীং ভিন্ন অবস্থায় পড়ে অমলার বুক দুরু-দুরু করে। ঘরের মধ্যেই দুশমন ঘুরছে একটা যেন। ড্যাবড্যাব করে কী রকমের

চাউনি! অথচ উপায়ও কিছু নেই। হিন্দু হয়ে মুসলমানের চাকরি, খাওয়া, তা সে যত বড় দোষের ভাগী হোক না কেন—এ বাজারে একেবারে অসম্ভব। হল্লা উঠবে, খবরের কাগজে লিখবে—এতটুকু ছোট্ট ব্যাপার নিয়ে পুরোপুরি এক দাঙ্গা বেধে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

মনিবের জন্য লোকটার হঠাৎ বাড়াবাড়ি রকমের উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে। বারম্বার সে ছুটে আসে: ডাক্তার সাব, থাকবেন না আর এখানে, বেরিয়ে পড়ুন। মেলা হাতিয়ারপত্তোর নিয়ে আসছে। পিছনের পাঁচিল টপকে চলে যান, ইলেকৃট্রিক-মিস্ত্রির মই এনে রেখেছি।

বেয়ারার সামনে, বিশেষ করে মুসলমানের সামনে, দুর্বলতা দেখানো যায় না। নরেশ ধমক দিয়ে ওঠে, আচ্ছা আচ্ছা, নিজের কাজে যাও। তোমায় ফঁফরদালালি করতে হবে না।

তাড়া খেয়ে আবদুল মুখ চুন করে সরে গেল। হাসপাতালের শুরু থেকেই আছে, নরেশদের খিদমত করে আসছে। সত্যিকার টান পড়েছে, না অভিনয়? মতলব করে মুখের ওই রকম ভাব করল ফাঁকার মধ্যে বের করে নেবার মতলবে। দুনিয়ার উপর কাউকে বিশ্বাস নেই। হাসপাতালের পাকা-বাড়ি, মজবুত দুয়ার-জানলা—ঘরে থেকে বিপদের সঙ্গে লড়া যাবে তবু খানিকক্ষণ।

অমলা কেঁদে বলে, ঘরে আটকে রেখে পুড়িয়ে মারবে। জতুগৃহ-দাহন।

বাইরে মাঠের উপরে তো এই কষ্টটুকুও করতে হবে না। এক এক কোপে সাবাড়। সেই মতলব ওদের।

আবদুলটাও সড় করেছে? বেইমান, নিমকহারাম—

এমন তো আখছার হচ্ছে। ভরসা দেয়, আশ্রয়ের লোভ দেখিয়ে জপিয়েজাপিয়ে খপ্পরের মধ্যে নিয়ে ফেলে। আবদুলেরও সেই এক পরিচয়—জাতে মুসলমান। আমরা হলাম হিন্দু, কাফের—ওদের চিরশত্রু।

আবদুল নেমে আবার গেটে চলে গিয়েছে। সেই ফাঁকে নরেশ এক বুদ্ধি করল। এক্স-রে ছবি তোলা হয়, তার পাশে ডার্করুম। চারজনে সেখানে ঢুকে দরজা দিল। এ-ও ঘর একটা, বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারবে না। ছোট্ট ঘর, দম আটকে আসে। বহাল-তবিয়তে দম নেবার দিন কোনদিন আর আসবে কি না, কে বলতে পারে!

যা বলেছে আবদুল—আবার একটা দল হামলা দিল অনতিপরেই। হাঁকডাকে মনে হয় দল প্রকাণ্ড। কানে গেল, রোগিদের ভিতর কে-একজন চেঁচাচ্ছে, ধর্ম ছাড়ছি। কলমা পড়ব। যা খাইয়ে তোমাদের বিশ্বাস হয়, তাই খেতে দাও।

দুড়ুম-দাড়াম বন্দুকের আওয়াজে তার কথার জবাব। কোলাপসিবল-গেটে হাতুড়ি মারছে, গেটের শিক খুলে খুলে ছুঁড়ছে ঝনঝনিয়ে।

আবদুলকে ধরে ফেলেছে: ডাক্তার কোথা রে?

ডাক্তার সাব? হি-হি করে দাঁত মেলে হাসে আবদুল, হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

কালীবাড়ি চলে গেল যে ডাক্তার।

গিয়ে পৌঁছেছে?

পৌঁছল আর কোথা! রাস্তায় পড়ে আছে। হি-হি-হি। হাতের মাথায় পেয়ে দিল গরদানে কোপ বসিয়ে।

বিবি আর বালবাচ্চা?

খতম বিলকুল। পাশাপাশি পড়ে আছে, দেখগে যাও। বুদ্ধিটা আমিই বাতলে দিলাম—বেরিয়ে পড়। ঘর থেকে বেরিয়ে অমনি দলের মুখে পড়ে গেল।

নরেশ ডাক্তারের ঘরদুয়োর তন্নতন্ন করছে। লরি রয়েছে সঙ্গে, বাক্স-পেঁটরা টেবিল-চেয়ার খাট-বিছানা ভাল জিনিস যত-কিছু বয়ে বয়ে লরিতে তুলে ফেলল।

হঠাৎ চুপচাপ, গোরস্থানের মতো নিঃশব্দ। রেজিমেণ্ট দেখা দিয়েছে হয়তো মহল্লায়, দেখে সরে পড়ল। আবার আসবে। এই একটুখানি লুকোচুরির ভাব রয়ে গিয়েছে এখনও। এরা জানে ওরাও জানে, তবু মিলিটারি বলে খাতির দেখানো। গুরুজনের সামনে হাতের আড়াল করে সিগারেট খাওয়ার যেমন বিধি।

কিছুক্ষণ গেল। ডার্করুমের দরজায় আবদুল টোকা দিচ্ছে। ফিসফিস করে বলে, চলে গেছে শয়তানের বাচ্চাগুলো। তিনটে বেমারি ঘায়েল করে গেল। যাবে কোথা? তোলা রইল। বিচার হবে রোজ কেয়ামতে। বাইরে আসুন ডাক্তার সাব। কী কাণ্ড করে গেছে দেখুন!

কী আশ্চর্য, গোপন আশ্রয় আবদুল জানত তবে! জেনে-শুনে কিছু বলল না। ধাপ্পা দিল, বেরিয়ে চলে গিয়েছে নরেশ ডাক্তারেরা সব, পথে পড়ে মরে আছে।

হাসে আবদুল, তার মধ্যেও গলা কেঁপে যায়: কী করব! এই আমার খোকি-দিদিরা—মুখ দিয়ে তাদের ইন্তেকালের কথা বলতে হল। তাই আর খোঁজাখুঁজি করল না। খুঁজলেও পেত না। হাসপাতালের ভিতরে এমন জায়গা, কোন লোক ধরতে পারে না।

তুমি কিন্তু ঠিক ধরেছ।

দেখলাম যে আপনাদের ঢুকতে। মন ভারি উতলা ছিল ডাক্তার সাব। শয়তানদের মতলব জানতাম। হাসপাতাল বলে রেহাই নেই, ডাক্তার বলে খাতির নেই। ভাবলাম, জায়গাটা দেখে রাখি সে-মুখো যেতে দেব না, জান আগলে ঠেকাব। একটা ঝোঁক কাটল ডাক্তার সাব, কিন্তু শেষ নয়। পালাতে হবে, ঘাঁটির মধ্যে পড়ে থাকলে রক্ষে হবে না। এখন দিনমানে বেরুনো বেয়াকুবি হবে। রাত্রিবেলা।

অমলা ভিন্ন চোখে তাকায় আবদুলের দিকে। তার হাত জড়িয়ে ধরে। বলে, খোকা মারা গেছে, তুমি আমার বড় ছেলে

আবদুল। নিজেদের কথা ভাবিনে—নীরা-ইরা তোমার এই বোন দুটো। এদের নিয়ে কী করব, তুমি ঠিক করে ফেল বাবা।

চার

হাসপাতালের পিছনে বাগিচা। নিশিরাত্রে মই বেয়ে ওরা পাঁচিলের উপর উঠল। লাফ দিয়ে পড় এবার ওদিকে। আবদুল মৃদুস্বরে তড়পাচ্ছেঃ কী হচ্ছে ডাক্তার সাব? ঐ উঁচুতে বসে থাকলে হবে না। দুশমনের নজরে পড়ে যাবে।

তারপরে খেয়াল হল, আচ্ছা বোকা তো আমি! ডাক্তার সাব অবিশ্যি পারেন লাফাতে, জেনানা তিনজন পারবে কেন?

তড়বড় করে মই বেয়ে সে-ও পাঁচিলে উঠল। মইটা তুলে নিয়ে ওদিকে লাগাবে। হল না। টিলার উপরে হাসপাতাল—পাঁচিলের বাইরে অনেকখানি নিচু, মইয়ে নাগাল পায় না। আবদুল তখন ওধারে লাফিয়ে কাঁধের উপরে মইয়ের গোড়া ধরেঃ নাম, তাড়াতাড়ি নেমে পড়, আমার কাঁধের উপর দিয়ে নেমে যাও।

যাবে গুরুদ্বারে। গুরুদ্বার-হরগোবিন্দ, ভাল পাহারার বন্দোবস্ত সেখানে, বিস্তর লোক গিয়ে জমেছে। সদর রাস্তায় আল্লা-হো-আকবর! নীরা আঁতকে ওঠে, ওরে বাবা! এমন দয়াময় আল্লাহ্‌ —কিন্তু সেই নামেও কচি মেয়ের অন্তরাত্মা শুকিয়ে ওঠে। আবদুলও ভাবছে কি এই সব? একবার খিঁচিয়ে উঠলঃ হারামির বাচ্চাদের আল্লাহ্‌ বোবা করে দেয় না কেন?

চার-পাঁচ শ আশ্রয় নিয়েছে গুরুদ্বারে। মানুষ দেখে সাহস হয়। কতদিনের উদ্বেগের পর রাত্রিটুকু এক ঘুমে কাটল। তোড়জোড় হচ্ছে, শোনা গেল, এইখান থেকে লরিতে তুলে নিয়ে স্টেশনে

স্পেশ্যাল-ট্রেনে তুলে দেবে। ট্রেন একছুটে একেবারে সীমান্তের পারে গিয়ে নিশ্বাস নেবে।

সকালটাও গেল ভালয় ভালয়। বস্তা কয়েক আটা আর চিনি এসে পড়েছে। তাল তাল আটা মাখতে লেগে গিয়েছে মেয়েরা। বেশ দুটো দল হয়ে দাঁড়াল—রান্নার দিকটায় মেয়েরা পুরুষদের ঘেঁষতে দেবে না। তৈরি হলে খেতে এসে বোস, স্পেশ্যাল-ট্রেনের কতদূর কি হল, এখন বরঞ্চ সেই খবর নাও। বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে—কড়া মিলিটারি পাহারায় রাত দুটোয় গাড়ি ছাড়বে। এরা বলছে—রাতে নয়, রাত্রিবেলা কেউ বেরুচ্ছে না, গাড়ি এসে সাইডিংয়ে থাকুক, দিনের আলোয় সকালে দল বেঁধে রওনা।

এই সব হচ্ছে, এর মধ্যে মিলিটারি একদল দেখা গেল। রাত্রে কিংবা কাল সকালে—সেইটে বোধ হয় পাকাপাকি করতে এল। হাতে হাতে বন্দুক; খোলা তলোয়ার ঝকমকিয়ে নাচাচ্ছে ক'জনে। তলোয়ার দেখে ভয় হয়ে যায়। সৈন্যের হাতে খোলা তলোয়ার কেন? যে যেদিকে ছিল, ঘরে ঢুকে পড়েছে। মিলিটারি, না খাকি পোশাকের ধাপ্পা? যারা পাহারায় ছিল, তারাই বা কি করছে? ঢুকে পড়ল এরা কেমন করে?

ঘরের ভিতর ক'টা লোকেরই বা জায়গা! মানুষের চাপে চাপে দম নেওয়া যায় না। বাইরের গর্জন এল: বেরিয়ে এস, এক্ষুণি—এক মিনিটের মধ্যে। হাতিয়ার সমস্ত এই তেঁতুলতলায় এনে রাখ। তল্লাশি করে কিছু পাওয়া গেলে কুচি-কুচি করব।

বিধি এই বটে! যথাসর্বস্ব ফেলে উদ্বাস্তু হয়ে চলে যায়, মনটা বোঝাই করে নিয়ে যায় আক্রোশ। সীমানা পার হয়ে গিয়ে নানান ছুতোয় সেদিকে হাঙ্গামা বাধায়। হাতিয়ার তাই সঙ্গে নিতে দেয় না।

হাতিয়ার নেই-নেই করেও তিন-চারজনের বোঝা। টমি-গান থেকে কলম-কাটা ছুরি। মসমস করে ক'জনে ঘুরে ফিরে দেখে এল। না, খালি হাত। লোহা-ইস্পাত এক টুকরা নেই কারও কাছে।

দ্বিতীয় হুকুম : সোনা-রূপো টাকা-পয়সা যার কাছে যা আছে, রেখে যাও হাতিয়ারের পাশে। তল্লাশিতে কিছু মিললে আমরা কিন্তু জানের জন্য দায়ী থাকব না।

নিঃসম্বল করে প্রাণটুকু মাত্র রেহাই দিয়ে যাবে, হুকুম-হাকামে এই বোঝা যাচ্ছে। তাই সই। পরের হুকুম : মেয়েপুরুষ দু'দল হয়ে বসে পড় দু'দিকে। মেয়েরা উত্তর দিকে ডরমিটরির পিছন দিকটায়; পুরুষরা উঠানে। একজন কেউ লাইন ছাড়া হয়ে থাকে না যেন। খবরদার।

দক্ষিণ প্রান্তে পুরানো গাছপালা অনেক। বাগিচাও বলা যেতে পারে। নিচু ডালপালা, ডালে ঝুলন্ত লতাপাতা—সব সুদ্ধ মিলে সবুজ দেয়ালের মতন। চক্ষুলজ্জা আছে যাই হোক; হয়তো এই দিনের বেলা মাথার উপরে খর সূর্য জ্বলছে বলেই। সাক্ষি না থাকে যাতে বাইরের কেউ। দশ-বার জনের এক-একটা দল গেঁথে ডাক দিচ্ছে, চলে এসো তোমরা। বিয়েবাড়ি পাতা পড়েছে যেন, ডাকছে। জায়গা সঙ্কীর্ণ বলে বেশি অতিথি একবারে নিচ্ছে না। নিয়ে যাচ্ছে লতাপাতার কুঞ্জবনের আড়ালে। যেতে চাচ্ছে না—আর্তনাদ। তলোয়ার নিয়ে কোন্ দিক দিয়ে অমনি ধেয়ে আসে জন পঁচিশ-ত্রিশ। পাঁঠা-বলির সময় খাঁড়া হাতে কামারের চেহারা যেমন। চেঁচামেচি যেন মন্ত্রবলে থেমে যায়। হাত নেড়ে ইশারা করে : চলে এসো ভালয় ভালয়। চলল গুটিগুটি পরম বশম্বদ ভাবে। সে দিকটায় কী যে হচ্ছে—যে রকম শব্দসাড়া হওয়া উচিত, তেমন কিছু নয়। সঠিক জানা যাবে একটুখানি পরেই—কারও দেরি হবে দশ মিনিট, কারও বা আধ ঘণ্টা। চোখের দেখাই শুধু, গল্পটা অন্য কাউকে বলবার জন্য ফিরতে দেবে না।

মেয়েদের টানা লাইন—ডরমিটরির কানাচে বসিয়ে আব্রুটা রেখেছে। মায়ের দুপাশে ইরা আর নীরা। নীরা মুখ নিচু করে

থাকে মাটির দিকে। সেদিক দিয়ে ইরার কিছু সুবিধা—দেবেশ যেবার মারা যায়, ইরাকেও বসন্তে ধরেছিল। বসন্ত সারল, কিন্তু মুখখানা শতচ্ছিদ্র মৌচাক বানিয়ে দিয়ে গেল। বিয়ে দেওয়া মুশকিল হবে, বাপ-মা কতদিন বলাবলি করেছে নিজেদের মধ্যে। আজকে তবু অনেকটা সোয়াস্তি এই মেয়েটার ব্যাপারে।

ফলের ঝুড়ি নিয়ে একদল এলো। বলে, মুখ শুকনো, খিদে পেয়েছে তোমাদের। খাও।

আবার বলে দুধ খাবে তো তার ব্যবস্থাও আছে। বেশি নয়, একটু গলা ভিজিয়ে নেবার মতো।

একজনে তার মধ্যে ফিক করে হেসে বলে, জন্মের শোধ খেয়ে নাও।

সেই লোকটা কেমন করে তাকায় নীরার দিকে। নীরা বলে, মা, আমার ভয় করছে।

একা নীরা নয়, আরও চার-পাঁচটির উপর ঐ রকম তাক। নীরা বলে, মা গো! কী হবে ও-মা?

অমলা বলে, দেবুর বসন্ত হল, ইরার হল—তোকে ছুঁল না। না খেয়ে না ঘুমিয়ে আরও যে রূপের ডালি সাজিয়ে বসেছিস।

সেই লোকটা তাড়া দিয়ে উঠল: ফিসফিস গুজগুজ—হচ্ছে কি তোমাদের? যা খাওয়ার খেয়ে শেষ করে ফেল।

লাইনের গোড়ার দিককার একটা মেয়েকে চিলে ছোঁ মারার মতো একজন গিয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে নীরার সামনের সেই লোকটারও দৃষ্টি ধকধক করে ওঠে। চোখের ঢেলার চেয়ে বন্দুকের বুলেট অনেক কোমল। নেবুর কোয়া দুটো খেয়ে শেষ করবার অবকাশ দিচ্ছে। বেশি গড়িমসি হলে তা-ও বোধহয় দেবে না। কুয়ো একটুখানি দূরে—হঠাৎ উঠে পড়ে নীরা লাফ দিল কুয়োর ভিতরে। নীরা পথ দেখাল—আরও গোটা দুই মেয়ে পড়ল তার পিঠ-পিঠ।

কী হল! কী হল!—করে ছোটে সবাই কুয়োর পাড়ে। অমলা

যেন পাথর, সেই এক জায়গায় অর্থহীন দৃষ্টি মেলে বসে আছে। তোলপাড়। জল তোলার বালতি দড়িতে বাঁধা—বালতি নামিয়ে দিয়ে উপর থেকে হুঙ্কার দিচ্ছে: দড়ি এঁটে ধর্। কানে যাচ্ছে না? দড়ি টেনে উপরে তুলব, প্রাণে বেঁচে যাবি।

কথায় হল না তো বালতি কিছু উপরে তুলে দড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। যতটা নজর চলে, মেয়েরা জলের উপর মাথা ভাসান দিয়ে আছে। ঠনাস-ঠনাস করে বালতির ঘা পড়ে মাথায়। শেষটা বালতি জলে ডুবিয়ে ওজনে ভারী করে ছেড়ে দিচ্ছে। যাক মাথা চৌচির হয়ে। তবু সাড়া আসে না কূয়োর ভিতর থেকে। ভয় পায় না, হুকুম শোনে না।

অমলা খিঁচিয়ে ওঠে ইরার উপর: তুই কী করিস রে ওখানে? চলে আয়, বস এসে যেমন ছিলি।

একটা লোক রেগে ছুটে এসে মারে এক লাথি। লাথির ঘায়ে উলটে পড়ে অমলা।

শয়তানী, তুই শিখিয়ে দিলি মেয়েটাকে। ফিসফিসিয়ে তাই শেখাচ্ছিলি। খোয়াবটা দেখ তবে চোখের উপরে।

নতুন ইট গাদা করা। গুরুদ্বারের বাড়তি ঘর হচ্ছিল। ঝুপঝাপ ইট ফেলছে কূয়োর ভিতরে। এ-ও এক আচ্ছা মজা। আরও মানুষ এগিয়ে আসে। অনেক হাতে ইট পড়ছে। আগে জলে পড়ার ঝুপঝাপ আওয়াজ আসছিল, এখন আর নয়—এখন ইটের উপর ইট। আর সেই ইট পড়ার তালে তালে অমলা হাততালি দেয়: খাসা হচ্ছে, খাসা। দিব্যি হচ্ছে। আর ভয় রইল না আমার নীরাকে নিয়ে।

ইরা ছটফট করে কাটা কবুতরের মত। কূয়োর ভিতর মাথা নামিয়ে দিয়েছে—দেবে নাকি লাফ? হেঁচকা টানে কে-একজন বুকের কাছে টেনে নিল। এ কোন্ মানুষ—আবদুল! আবদুল-দাদা, তোমায় দেখতে পেলে নীরা কূয়োর জলে যেত না।

এমনিই শৌখিন মানুষ—কিন্তু আজকে একেবারে চেনা যায় না আবদুলের এই অপরূপ সজ্জায়। মাথায় দিয়েছে জরির কাজ-করা টুপি, গায়ের মির্জাই আরও চেকনাই। খোস-বু ভুরভুর করছে গায়ে। বিয়ে করতে এসেছে যেন বর হয়ে। যেন এই দলেরই পুরোপুরি একজন—সাজগোজ করে এসে পৌঁছতে কিছু দেরি হয়ে গেছে। আড়কোলা করে টপকে নিল সে ইরাকে। দু'পাটি দাঁত মেলে হাসতে হাসতে হুমকি দিয়ে ওঠে অন্য সকলের উপর: এদিকে কেউ তাকাবি তো চোখ ফুটো করে দেব। চার বরষ এক সঙ্গে এক বাড়ি থেকেছি—আমার হক্কের পাওনা। আসবাব-পত্তোর বারজনে লুঠে নিলি, কিন্তু আওরত ছেড়ে দেব না।

যারা কাছে ছিল, সরে গিয়ে আবদুলের পথ করে দিল: পুরানো আসনাই ওদের—সর, ঝামেলা কোরো না। ফ্যা-ফ্যা করে হাসে কেউ কেউ: কত হুরী-পরী কত দিকে—এই চেহারায় বাউরা হলি? হ্যাক-থুঃ, হ্যাক—

আরও কি হত, কে জানে? হঠাৎ এক ভোজবাজি। লোকগুলো দৌড়চ্ছে। দৌড়ে বেরিয়ে গেল, একজনও আর নেই। মিলিটারি বড়কর্তা কেউ এসে পড়ল নাকি? যে আল্লাহ্‌র জয়ধ্বনি দিচ্ছে, তিনিই বুঝি পাঠালেন! আর এক হতে পারে—এখানকার যত-কিছু লভ্য, সমস্ত উশুল হয়ে গিয়েছে। আছে মানুষগুলো—মানুষ মেরে হাতেরই সুখ, গাঁটের মুনাফা নেই। হয়তো নতুন শিকারের খবর হয়েছে, তাই সবাই ছুটে বেরুল।

সরকারি বন্দোবস্ত নড়চড় হবে না। পরের দিন যথাসময়ে লরির বহর এসে দাঁড়াল গুরুদ্বারের দরজায়। দু-তিনখানায় মানুষ উঠল, কপালগুণে তখন অবধি যারা বেঁচে রয়েছে। লরি মিছিল করে পৌঁছে দিল স্টেশনে। স্পেশ্যাল-ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে।

এর মধ্যে আবদুল কখন প্লাটফরমে ঢুকে পড়েছে। বাইরের

কাউকে আসতে দেবে না, সে কেমন করে ঢুকল খোদায় মালুম। ইরাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। কালকের টুপি-মের্জাই নেই। তবু চিনে ফেলে দু-চারজন। এখানে সবাই আজ এক জাতের লোক, এক রকমের মনের ব্যথা। তার মধ্যে ভিন্ন একটিকে পেয়ে গিয়েছে। রে-রে করে ঘিরে ধরল। সকলের সমস্ত রাগের শোধ নিচ্ছে একজনের উপর দিয়ে। লম্বা চুল ছিঁড়ছে টেনে টেনে, ঘুষির পর ঘুষি মারছে। কপাল ফেটে চোয়াল ছিঁড়ে দাঁত ভেঙে রক্তারক্তি। ধারা বয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। অমলা দেখতে পেল কামরার জানলা দিয়ে। আহা, একটা দিনে একেবারে বুড়ি হয়ে গিয়েছে অমলা! দু'হাত তুলে সে চেঁচাচ্ছে, মের না গো। ও আমাদের আবদুল—

আবদুলের গায়ে যেন সাড় নেই। এ-সব যেন কিছুই নয়। ব্যাকুল হয়ে সে বলে, গাড়ি ছাড়ে। ইরা-বহিনকে তুলে নাও মা। তোমার দৌলত তোমার কাছে পৌঁছে দিলাম, খোদার কাছে আমি খালাস।

পড়ে গেল টলতে টলতে। পুলিশ ছুটে এলো, নয়তো শেষই করে দিত ঐ প্ল্যাটফরমের উপর। গাড়ি ছাড়ল। তখন আবদুল উঠে দাঁড়িয়েছে আবার। প্ল্যাটফরম পার হয়ে যায় গাড়ি। ভিন্ন জাতের ঐ আদরের মানুষ ক'টিকে আবদুল শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে।

পাঁচ

ওই হল লাহোরের কথা। লাহোর অনেক দূর। চলে আসুন কলকাতা শহরে। লাহোরের খবর এসে পড়েছে কলকাতায়। আরও নানা অঞ্চলের খবর। ছোট্ট দুনিয়ার ভিতরে কোন-কিছু আজ চাপা থাকে না। সত্যি যা ঘটেছে, পথ ঘুরতে ঘুরতে তার উপরে অনেক ডালপালা জুড়ে যায়।

ক্ষেপে উঠেছে এখানকার মানুষ—বদলি চাই, রক্তের বদলে রক্ত। নিরীহ এই সব লোকের উপরে কেন, এরা কোন দোষে দোষী? কিন্তু সব অঞ্চলেই তো এই খাটে। অন্য জায়গায় যারা সব মরেছে, আর এই যারা শুধুমাত্র প্রাণটুকু নিয়ে এসে পড়ল, তাদেরই বা কোন দোষ ছিল? মানুষ যেন হিংস্র জানোয়ার। ভুল বললাম, জানোয়ারও লজ্জা পেয়ে যায় হিংস্র মানুষের কাছে।

কলকাতা শহরের রানীবাগান পট্টি। মসজিদ রাস্তার উপরে। মসজিদের পাশ দিয়ে গলি। গলি ধরে যান এগিয়ে। উল্টো দিকে ঘরবাড়ি। একটা দরজা। দরজায় ঢুকে পড়ে এক ফালি ফাঁকা জায়গা সামনে। গৌরবে উঠান। কল-পায়খানা উঠানের উপর, এদিকে-সেদিকে চালাঘর। খোলার চাল, টিনের চাল। অগণ্য ছোট ছোট খোপ চালের নিচে। মানুষ অগুণতি। এই হল রানীবাগান। কোন্ রানী কবে বাগান বানিয়েছিল, নামটাই আছে—রানী নেই, বাগানের গাছপালা পড়ে মরুক, হালে দুটো গাঁদা-দোপাটি বসাবেন তার এক হাত জায়গা মিলবে না কোন দিকে।

ওর ভিতরে গোটা তিনেক খোপ নিয়ে আলিমের বাসা। বুড়ি মা, বউ আর বাচ্চা ছেলে। এই পাড়ায় জন্ম, ছোট্ট বয়স থেকে এখানে মানুষ। নিজেদের পাকাবাড়ি ছিল মসজিদের পশ্চিমে রাস্তার সদরের উপর। এখন যেটা মিত্র-নিবাস—দরজার পাশে মার্বেল-পাথরে নাম লিখে দিয়েছে। পৈতৃক ধারদেনায় বাড়ি বিক্রি হয়ে যায়, ভূষণ মিত্তির কিনে নিলেন। সেই সময় কিছু টাকাও এসে পড়েছিল আলিমের হাতে। টাকাটা নষ্ট করে নি, বুদ্ধি করে টুপির দোকান করেছে চাঁদনিতে। আর কাছাকাছি এই টিনের ঘরে এসে উঠেছে। মিত্র-নিবাসে রোজ তাসের আড্ডা। আটটায় দোকান বন্ধ করে আলিম সেখানে গিয়ে বসে। আড্ডা ভাঙতে রাত দেড়টা-দুটো। ঘুমোয় ন'টা অবধি। ঘুম থেকে উঠেই দু'মগ জল মাথায় ঢেলে দুটো

নাকে-মুখে গুঁজে ছুটল চাঁদনিতে। গিয়ে দোকান খুলবে। এই হল জীবন। আছে বেশ।

এই সংসারে কিছু দিন থেকে ভাগনী এসে উঠেছে। লায়লা। কলেজে পড়ে। চাকুরে বাপের মেয়ে, এমন সব জায়গায় থাকবার কথা নয়, কিন্তু হঠাৎ বাপ মরে যাওয়ায় কলকাতার বাসা তুলে দিতে হল। মা নেই, সৎমা। বাসা তুলে তিনি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে গাঁয়ের বাড়ি উঠলেন। লায়লা কী করে? শেষ পরীক্ষার মাস সাতেক বাকি, লেখাপড়াতেও ভাল—হঠাৎ এই সময় ইস্তফা দিয়ে গাঁয়ে গিয়ে উঠতে মন চায় না। আলিম বলে, তবে চলে আয় গরিব মামুর ঘরে, কষ্টেস্‌ষ্টে কাটিয়ে দে এই ক'টা মাস এগজামিন অবধি।

ছিল বেশ। একদিন এমনি আড্ডা চলছে। মিত্র-নিবাসের ভূষণ মিত্তির বললেন, কিছু মনে কর না বাবা আলিম। সকাল সকাল তুমি ঘরে চলে যাও।

কেন?

ন্যাকা ছেলে! চলে যাও, তাই বলছি। দিনকাল বুঝতে পার না?

আলিম হেসে ওঠে: মুশকিল হয়েছে চাচামশায়, এখন এই এগারটা রাত্রে বাড়ি গিয়ে ঢুকলে আমার বুড়ি মা অবধি ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠবে। ভাববে, অসুখ করেছে ঠিক। নয়তো এত সকাল সকাল ফেরে কেন?

হাসল বটে, কিন্তু মনের ভিতরে কাঁটা খচখচ করে বিঁধছে। সত্যি কিছু বোকা নয় সে। রানীবাগানের বার আনা মানুষ সরে পড়েছে। কলের নিচে বসে যতক্ষণ খুশি চান কর, কেউ কিছু বলতে আসে না।

লায়লার সকালবেলা কলেজ। সে-ও দেখি চুপচাপ ঘরের মধ্যে। আলিম বলে, তোর কি হল?

কলেজে যাব না। রেলে চাপবার উপায় নেই—রেলের পথেও

শুনতে পাই গোলমাল। নয়তো ছেড়ে ছুড়ে দেশে চলে যেতাম—মা ভাইবোন যেখানে। এখানে ভাল লাগে না। আমি এগজামিন দেব না মামু।

হল কি রে ?

কলেজের মেয়েরা দেখতে পারে না আমায়। প্রফেসারদেরও সন্দেহ।

চোখ টলমল করে আসে, আর বলতে পারে না। গলায় গলায় ভাব যাদের সঙ্গে, হঠাৎ তারা যেন কী রকম হয়ে গেল! এমন কি সবিতা অবধি। একটা দিন না দেখলে এই রানীবাগান অবধি ছুট করে চলে এসেছে, সেই সবিতা পাশ কাটায় এখন, অন্য বেঞ্চিতে বসে। নানা জায়গায় হাঙ্গামার খবর আসে—লায়লার দিকে মেয়েরা চোখ পাকিয়ে চায়, সে-ই যেন দায়ী। কথাবার্তা তাকে আড়াল করে বলে। সে যেন চর, শুনে গিয়ে সমস্ত বলবে জাতভাইদের কাছে। দম আটকে আসে। আবার যদি ভাল সময় আসে, তখন যাবে কলেজে। তার আগে নয়।

লায়লা বলে, মামী ভয় পেয়ে গেছে। পাবারই কথা। সময় থাকতে ভেবেচিন্তে কিছু কর মামু। শেষটা কিন্তু পালাবার পথ পাবে না।

আলিম খাচ্ছিল। মুখ তুলে আশ্চর্য হয়ে বলে, পালাব কেন রে ?

লায়লা রাগ করে বলে, রানীবাগানের আর সবাই পালাচ্ছে কেন ? বল-শক্তি তোমার চেয়ে কম ? চারিদিক বিলকুল ফাঁকা হয়ে গেল, তুমি কিছু দেখতে পাও না। চোখ বুজে বেড়াও তুমি।

অবহেলার হাসি হেসে আলিম বলে, ওরা আর আমি! তিন পুরুষ বসতি এ-পাড়ায়। গলা চড়িয়ে কেউ কিছু বলতে আসুক, অমনি দেখবি পাড়ার ছেলেরা সেই লোকের টুঁটি চেপে ধরেছে। নতুন এসেছিস, তুই জানিস নে—আলিমদার নামে চারিদিকে সির্নি পড়ে যায়।

খেয়ে-দেয়ে যথারীতি সে দোকানে বেরুল। আলিমের বউ বলে, দেখলে তো? ঐ রকম। কী করবে কর তুমি এখন। আমাকেও অমনি যা-হোক বলে দিয়ে নাক ডেকে ঘুমোয়। নিজেদের জন্যে ভাবি নে, আমার ওই নীলুফার—

কথা তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নেয় লায়লা। সইতে পারে না। আট বছুরে মামাতো ভাইকে ডাক দেয়, শুনে যাও নীলু। বড্ড মজা তোমার। পড়াশুনো নেই, মক্তব বন্ধ, এমনি বারমাস চললে খুব ভাল হয়, না? সে হবে না। বই নিয়ে এসো, আমি পড়াব।

সেদিন আলিম একেবারে সন্ধ্যারাত্রে ঘরে ফিরল। মিত্র-নিবাসে সবে গিয়ে বসেছে, চায়ের বাটিটাও হাতে নেয় নি, ভূষণ মিত্তির বললেন, তুমি আর এসো না বাবা আলিম। মানুষজন গরম। আমার বাড়ির উপরে শেষটা যদি কিছু হয়, বিপদের অন্ত থাকবে না।

আলিম নিশ্চিন্ত স্বরে বলে, কিছু হবে না চাচামশায়। আমার নিজের পাড়া। চিরকালের বসতি—আমার আব্বাজান জীবন কাটিয়ে গেছেন। তাঁরও আব্বা—

ভূষণ বলেন, সে আমি বুঝি আলিম। আগে ছিল এটা পাড়াগাঁ জায়গা—জানাশুনো ভাবসাব সকলের মধ্যে। শহর জমে উঠে এখন কত উটকো লোক এসে পড়েছে—তারা কি বোঝে, তোমার এখানে কত জোর? তোমার আমার আর কোন খাতির নেই। পাঞ্জাবিরা ক্যাম্প খুলেছেন আবার এই পাড়ার ভিতরে। ভিখারির বেহদ্দ হয়ে এসে কত মানুষ আশ্রয় নিয়েছে! মনে মনে তাদের বিষের জ্বলুনি। তাই বলছি, যাও তুমি এক্ষুণি। ঘরে গিয়ে বসগে।

হাসতে হাসতে আলিম বলে, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন চাচামশায়?

এই তুমি বুঝলে বাবা? চাচা বলে ডাক, সামাল করে দিচ্ছি

সেজন্যে। এমনি অবস্থা, আমরা আগলে দাঁড়ালে আমাদেরও রেহাই করবে না। চলে যাও তুমি এক্ষুণি, ঘরে গিয়ে বোসোগে।

ঘাবড়ে গেল আলিম। পায়ে পায়ে বাড়ি এসে ভাগনীকে ডাকে: কী করা যায় লায়লা? এই জায়গাটুকু ছাড়া দুনিয়ার কোনখান চিনি নে। খুলনার কোন্‌খানে বাড়ি ছিল, আব্বার মুখে ছোটবেলা শুনেছিলাম, গাঁয়ের নামটাও মনে নেই। কোন্ চুলো খুঁজে বেড়াই এখন বল দিকি? কোন্ ভরসায় সব সুদ্ধ বেরিয়ে পড়ব?

লায়লা বলে, ঝাউতলায় মোবারক মোল্লার সঙ্গে দেখা কর মামু।

ভ্রূ কুঁচকে আলিম বলে, কেন? লোকটা ভাল নয় শুনেছি। বাংলাদেশেরও নয়। বাইরে থেকে এসে গরম গরম বুলি ছাড়ছে।

কিন্তু করিৎকর্মা লোক। আমাদের মতন যারা ফাঁকে ফাঁকে আছে, সকলকে নিয়ে এক জায়গায় করছে। তাহলে হামলার ভয় থাকবে না।

আলিমের কণ্ঠ হাহাকারের মতো শোনায়: হায় নসিব! আমার আপন কোট ছেড়ে দিয়ে কোথাকার কোন্ মোল্লার দোয়ায় বাঁচতে হবে? সে-লোকের মুখের জবানই তো অর্ধেক বুঝব না। বলিস নে আমায় ওসব, আমার দ্বারা হবে না।

আর একটি কথা না বলে না খেয়ে সটান সে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল। আলিমের বউ কেঁদে বলে, শুনলে তো? ও নড়বে না, তাসের আড্ডা হয়েছে কাল। আড্ডা থুয়ে এক-পা কোথাও যাবার জো নেই। এইখানে কবর হবে আমাদের। কেউ থাকবে না, আম্মা-নীলু-তুমি-আমি সকলে যাব। ও নিজেও যাবে।

লায়লা তাড়া দিয়ে ওঠে: আঃ, কী সব বল মামী? চুপ কর বলছি। চারিদিকে এই অবস্থা—কু-ডাক ডাকতে ডর লাগে না তোমার?

নানীর কাছে গেল লায়লা। মামী সঙ্গে চলল। নানীকে

সুপারিশ ধরবে। মাকে খুব মান্য করে আলিম। তিনি বললে যদি রাজি হয়।

মামাকে তুমি একবার বলে দাও নানী, কালকেই চলে যাক ঝাউতলা রোডে। মোবারক মোল্লার সঙ্গে দেখা করে আসুক।

নানী আর-এক মানুষ। পানের বাটা এনে পান সাজতে বসল পা ছড়িয়ে দিয়ে। কুটুর-কুটুর করে সুপারি কাটে। বলে, দিদি, একটা পান খা—

অধীর কণ্ঠে লায়লা বলে, পান আমি কবে খেয়ে থাকি?

খাস নে তো অভ্যেস কর্। শালিকের মতন হলদে ঠোঁট দুলাভাইয়ের মনে ধরবে না।

আলিমের বউ ফিসফিসিয়ে বলে, দেখলে তো? চৌদিকে বেড়া আগুন—এখন হল হাসি-মস্করার সময়! যেমন মা তেমনি ছা, ওরা ওই রকম।

বুড়ি বলছে, ঘরে নেবে না তোকে। আমার পান-খাওয়া রাঙা মুখ দেখে মজে যাবে দুলাভাই। আমায় নিয়ে দোর দেবে। সারারাত ছাঁচতলায় তুই ছটফট করবি, তখন কিন্তু গাল দিতে পারবি নে।

না, গালমন্দ দেব না, ছাঁচতলাতেও যাব না। ঘরে বসে ডিবে ডিবে পান সেজে পাঠাব তোমাদের। তোমরা মুখ আরও রাঙা কোরো। তোমার সে দুলাভাই কোন্ চুলোয় জানি নে। যেদিন আসবে তুমিই ঘর কোরো নানী, আমি শরিক হতে যাব না। আমি লেখাপড়া করব, পাস করব, বিলেত যাব। কিন্তু বর যে দিয়ে দিলাম, তার দেনমোহর চাই। আগাম চাচ্ছি—আজকেই। সেই জন্যে এসেছি।

মোলায়েম সুরে আবদারের ভঙ্গিতে বলল, দরবারে এসেছি নানী গো। মামী আর আমি দু'জনে এসেছি।

বউ অন্ধকারে ছিল, সেদিকটা এতক্ষণ নজর পড়ে নি। ব্যাপার কিছু ঘোরাল বুঝে নানী জিজ্ঞাসা করে, কি ?

গোড়াতেই তো বললাম। তুমি কানে নিলে না। চলে যেতে হবে এ-বাড়ি ছেড়ে, এ-পাড়ায় থাকা যাবে না।

শেষ অবধি শোনবার তর সয় না, বুড়ি ক্ষেপে উঠল : কে থাকতে দেবে না শুনি ? কার চালে চাল দিয়ে বসত করি ? থাকব এখানে চিরকাল। কে তাড়াতে চায়—মাথায় তার কড়কা পড়ুক, মুখের উপরে মুড়ো-ঝাঁটা। কে কি বলেছে শুনি ?

বউ লায়লার হাত ধরে টানে : নাও, হল তো ? চলে এসো।

বাইরে এসে শুনতে পাচ্ছে, হামানদিস্তায় পান ছেঁচছে বুড়ি। ঠনাঠন-ঠকঠক ঠনাঠন-ঠকঠক। জোরটা আজ বড় বেশি। যারা ওদের যেতে বলছে, পান না হয়ে তাদের মাথা হলেও ছেঁচে তাল পাকিয়ে যাবে।

ছয়

আলিম যাবে না তো ভোরবেলা লায়লা নিজেই ঝাউতলা রোডে চলে গেল। গোটা রাস্তার চেহারা পালটেছে। সে এক দেখবার বস্তু। অগণ্য মানুষ এসে জুটেছে রাস্তার দু'পাশের সমস্তগুলো বাড়ি নিয়ে। যাদের বাড়ি, তারা একটা-দুটো ঘর নিজেদের জন্য রেখে বাকি-সব মেহমানদের দিয়ে দিয়েছে। এলাহি ব্যাপার—ঘড়ির কাঁটার মতন নিখুঁত কাজকর্ম। মোবারক মোল্লা আর তাঁর সাথী-শাগরেদ পাগল হয়ে খাটছেন।

লেখাপড়া-জানা বুদ্ধিদীপ্ত মেয়ে লায়লা—শতেক কাজের মধ্যে মোল্লা সাহেব সামনে বসিয়ে খাতির করে তার কথা শুনলেন। আর একজন—লোকটা বাঙালি—মোল্লা সাহেবের ডান হাত বলে মনে হয়। পরিচয় দিতে সে চিনে ফেলল : আলিম—আরে চাঁদনিতে

যার টুপির দোকান ? এক নম্বরের হারামি। মোসলমান হয়েও বড় দুশমন সে আমাদের। চাঁদনিতে মীটিং করতে গেলাম, চাঁদা চাইলাম। আলিম বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, এক পয়সাও চাঁদা দেব না আমরা কেউ। হিঁদুর সঙ্গে তার খানাপিনা দহরম-মহরম। হিঁদুর চেয়ে বড় দুশমন সে আমাদের।

আদ্যোপান্ত শুনে মোবারক মোল্লা রাগে গরগর করছেন: বেইমান, কমবখ্‌ত্‌! এক গাদা চুড়ি বের করলেন। বাক্স-ভরা চুড়ি—মোটা কাচের সাদামাঠা বস্তু। বলেন, লাহোর লড়াই ফতে করে ফেলল, আমাদের কিছু হয় না। হয় না ওদেরই জন্য। লাহোর থেকে চুড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে মাতব্বররা হাতে পরবে বলে।

পুরানো ইট একখানা টেবিলের উপরে। বলেন, মসজিদ ভেঙেছে, তার ইট। কিছু না পারি তো এই ইট মাথায় ঠুকে মরা উচিত আমাদের জাতের। তোমরা সবাই চলে এসো, তোমাদের আশ্রয় দেব। কিন্তু আলিম মিঞার জান-মানের দায়িক হতে পারব না। হিঁদুর জায়গা হবে তো তার এখানে জায়গা নেই।

এক ঘর লোকের মধ্যে লজ্জায় অপমানে মাথা নিচু করে লায়লা ফিরে এল। আলিম তেল মাখতে মাখতে শুনছে। সমস্ত শুনে হো-হো করে হেসে উঠল। বলে, ইটের গায়ে লেখা আছে নাকি মসজিদ থেকে ভেঙে-আনা ? বুঝিস না, অমনি সব বলে বলে লোক ক্ষেপাচ্ছে।

কিন্তু মামু, চাঁদনির মীটিঙে অপমান করেছিলে তুমি ওঁদের। চাঁদা দেবে না বলেছিলে।

আলিম বলে, চাঁদা তুলছিল গোলমাল বাধাবার মতলবে। তাই বুঝে সকলকে আমি মানা করলাম: দোকান করে খাই, হাঙ্গামা-হুজ্জুতের মধ্যে আমরা নেই। এসব করে বেড়ায় যাদের রাজা-উজির হবার মতলব। ছা-পোষা মানুষ আমরা—গণ্ডগোলে মাথা দিতে গেলে মারা পড়ব।

সেই রাগ পুষে রেখেছে। এই দেখ, চুড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে তোমার জন্য। চুড়ি পরে জেনানা হয়ে তোমায় অন্দরে যেতে বলেছে।

নানী বুড়ি কোথায় ছিল, ছিনিয়ে নেয় সেই চুড়িঃ বাঃ বেশ ঢকসই চুড়ি, মানাবে ভাল। পর দিকি দিদি। রোস্, আমি পরিয়ে দিচ্ছি।

এই হল আলিমের মা। সেকেলে বুড়ো মানুষ—একভাবে দিন কাটিয়ে এসেছে, একালের অতশত বোঝে না। চুড়ি পরিয়ে দিয়ে কেমন হয়েছে, নাতনীর সুডোল হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে।

মন ভাল নেই। খেয়েদেয়ে আলিম দোকানে বেরুল। ট্রামে এসপ্লানেড গিয়ে নেমেছে। চাঁদনিরই অন্য এক দোকানদারের সঙ্গে দেখা। বন্ধুলোক। সে সামাল করে দেয়ঃ খবরদার, আর এক পা এগিও না।

কি হয়েছে?

কে কোন্ দিক দিয়ে মেরে বসবে, ঠিক কি?

আলিম বলে, শহর দুই এলাকায় ভাগ হয়ে গেছে। বাপের জন্মেও ভাবতে পারি নি এমন। কিন্তু চাঁদনি তো আমাদের—মুসলমানের ঘাঁটি। আমার তবে ভয়টা কিসের? আমায় কিছু বলবে না।

জানবে কি করে কোন্ জাতের তুমি? মানুষের গায়ে তো মার্কা মারা থাকে না। দাড়ি রেখেছ, লুঙি পরেছ? তোমার পরনে পাণ্টলুন—হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সর্বজাতে যা পরে থাকে।

কিন্তু লুঙি পরে তো এই এদ্দূরও আসতে পারতাম না। ওদিককার হিন্দুপাড়া থেকেই ঠুকে দিত।

হো-হো করে আলিম হেসে উঠল এক মজার কথা মনে পড়ে। বলে, যা গতিক—ব্যাগে রকমারি পোশাক নিয়ে চলাফেরা করা

উচিত। এই এদ্দূর আসব ধুতি পরে কোঁচা ঝুলিয়ে। ধুতি ছেড়ে এইখান থেকে লুঙি। ধর্মতলা ছাড়িয়ে ফের আবার লুঙি বদলে ফেল। অবস্থা বুঝে ভোল পালটাও—এই যে পারে, দুনিয়ায় তার ভাবনা কিছু নেই।

হাসি দেখে বন্ধু অবাক হয়ে যায়। হাসতে তো লোকে ভুলে গিয়েছে। মাথার উপরে খড়গ, তার মধ্যেও প্রাণখোলা এমন হাসি হাসতে পারে—আজব মানুষ এই আলিম মিঞা।

বন্ধু বলে, গোয়াতুর্মি কোরো না। চাঁদনিতে গিয়ে লাভটাই বা কি? খদ্দের নেই, দোকান খুলে কি হবে? লুঠপাটের ভয়ও আছে। হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, তা ছাড়া আছে চোর-ছ্যাঁচোড়-দাঙ্গাবাজের আর এক জাত। এই বাজারে রুজি-রোজগারের মওকা খুঁজে বেড়াচ্ছে। মুসলমান-হিন্দু সকলকে এক সঙ্গে মিলিয়ে সেই জাতটা।

ফিরল আলিম। হাসুক আর যা-ই করুক, মনটা খারাপ যাচ্ছে আজ সকাল থেকে। আনমনা হয়ে যাচ্ছিল। পিছন থেকে হঠাৎ ছোরা বসিয়ে দিল। বুঝতে পারে নি গোড়ায়। ঢিল এসে পড়ল যেন গায়ে, অথবা চিল পড়ে ঝাপটা দিয়ে গেল। পিছন ফিরে দেখল, দুটো লোক দৌড়ে পালাচ্ছে। মিত্র-নিবাসের ঠিক সামনে। প্রায় দোরগোড়ায়। পলকের মধ্যে ঘটল। আলিম চেঁচাচ্ছে, আমায় ছোরা মেরেছে চাচামশায়। কেষ্টদা, লালুভাই, বেরিয়ে পড় তোমরা। ধর ধর, ঐ পালায়—

আলিমের চোখে আঁধার দিচ্ছে। আকুল হয়ে দোতলার ঘর-খানার দিকে তাকায়—অনেক কাল আগে তার আব্বার শোবার ঘর ছিল যেটা। সেই ঘরে ভূষণ মিত্তির থাকেন আজকাল। জানলা বন্ধ। বাড়িতে কেউ নেই?—না, কোনরকম দরদ দেখালে তাঁদের উপরেও গিয়ে পড়বে, সেই ভয়ে মুখ বের করছেন না? তখন মিত্র-নিবাসের সদর-দরজায় আলিম হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। প্রাণপণ

শক্তিতে দরজা ঝাঁকাচ্ছেঃ ও কেষ্ট, ওরে লালু, কেউ তোমরা বাড়ি নেই ?

মেজ ছেলে কেষ্টকে নিয়ে ভূষণ মিত্তিরের দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। পাড়ার উৎপাত হয়ে উঠেছে। খাওয়ার সময়টা বাড়ি আসে, বাকি সময় পাত্তা পাওয়া যায় না। লোকের মুখে নানান কথা কেষ্ট ও তার দলবলের সম্বন্ধে। দাঙ্গার এই সময়ে সেই কেষ্ট বিষম করিৎকর্মা হয়ে উঠেছে। মিত্র-সংঘ বলে এক টিমটিমে ক্লাব তাদের—হঠাৎ তারা দুর্গতের সেবায় উঠে পড়ে লেগেছে, দেখা গেল। সংঘেরও দুর্গত অবস্থা কেটেছে। রমারম পয়সাকড়ি খরচ করে। পাড়ার মধ্যে এমন সাহসী কর্মী ছেলে—কেষ্টর বলেই আলিমের বল অনেকখানি। কিন্তু কেউ বাড়ি নেই যে আজ! টলতে টলতে যেন নেশার ঘোরে চলেছে। আর নিভন্ত আলোর সকলখানি উত্তাপ নিয়ে চিৎকার করছে, ছোরা মেরেছে আমায়। আমি আলিম বলছি। ছোরা মেরে আমার পাড়ার ভিতর দিয়ে পালিয়ে গেল।

আশ্চর্য কাণ্ড! জনমানব নেই, কেউ সাড়া দেয় না। মসজিদের গলিতে ঢুকে চেঁচাচ্ছে। জুম্মাবারে আজকেও মসজিদ খা-খা করছে। বাড়ির দরজায় গিয়ে ঘা দিল, ও মা, দোর খুলতে বল শিগগির। দাঁড়াতে পারছি নে। আমায় মেরে দিয়েছে।

এত রক্ত ছিল—এ আল্লাহ্, ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। দেখে ভিরমি লাগে। দোরের গোড়ায় আলিম গড়িয়ে পড়ল।

সাত

সারা কলকাতা জুড়ে দাঙ্গার আগুন। দাউ-দাউ করে জ্বলছে। লাহোর কিংবা অন্য যে জায়গার কথাই বলুন, কলকাতা পিছিয়ে নেই কারও চেয়ে। দুনিয়া জোড়া দু-দুটো লড়াইয়ের ঝড় পাশ কাটিয়ে গেল শুধুমাত্র কয়েকটা বোমা ফেলে। মনে বুঝি আপসোস ছিল—তা বিনি-লড়াইয়ে মানুষ মারার শখ আচ্ছা করে মিটিয়ে নিচ্ছে।

এত বড় রানীবাগানের ভিতর কুল্যে তিনটে মেয়েলোক আর দুই বাচ্চা। দিনরাত দুয়োর দিয়ে আছে, আর আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া পাড়ছে। তাঁর অজানা কিছুই তো নেই—কোন এক অঘটন ঘটিয়ে উদ্ধার করে দিন। হয়তো কোন মহাপ্রাণ মোটর ছুটিয়ে এসে থামলেন মসজিদের গলির মুখে: গাড়িতে উঠে এসো তোমরা, কোন ভয় নেই। ছোরা-লাঠির সামনে দিয়ে সেই গাড়ি সাঁ করে ছুটে বেরুবে, বেকুব হয়ে তাকিয়ে থাকবে দুশমন। নিয়ে গিয়ে খাবার দেবে। দেদার পেট ভরে খাওয়াও বাচ্চাদের, নিজেরা যত ইচ্ছে খাও। অথবা হেলিকপ্টার একটা উড়তে উড়তে চালের উপর এসে তারে-বাঁধা ঝুড়ি নামিয়ে দিক। কয়লার খাদে যেমন করে। উঠে এসো সকলে তোমরা ঝুড়িতে করে। তখন আর মারমুখো মানুষের মুখোমুখি হতে হবে না—সোজা আকাশে উঠে গেল। দুনিয়ায় কত আজব ঘটছে, এমনি একটা-কিছু হয় না?

আলিমের মা বুড়ি চুপ হয়ে গিয়েছে। জায়গা নিয়ে চিরকালের জোর আর নেই। ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। আশির কাছাকাছি বয়স—এতকাল যেমন দেখে এসেছে, কোন কিছুর সঙ্গে মেলে না। মানুষের ছায়া দেখলে ভয়। সদর-দরজার আংটায় বড় তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। বাইরে থেকে তালা দিয়ে পাঁচিল বেয়ে অনেক কষ্টে

উপরে উঠে চালে চালে ভিতরে এসে পড়ল। করছে এসব লায়লা—তারই যত বুদ্ধি। ওই একজনই কেবল মাথা ঠিক রেখেছে। সাহস-হিম্মতে জোয়ানপুরুষকে ছাড়িয়ে যায়। বাইরে থেকে লোকে বুঝবে, রানীবাগান বিলকুল ফাঁকা, সমস্ত প্রাণী পালিয়েছে। নিজেদের কামরাতেও ঠিক এই রকম—সামনের দরজায় তালা, অন্য সব দরজা ভিতর থেকে খিল আঁটা। দিন কাটে, রাত্রি কাটে। আল্লাহ্‌কে ডাকে মনে মনে। ঘরের মধ্যেও ফিসফিসিয়ে কথা বলতে ভয়। দেয়াল ফেটে আওয়াজ বেরিয়ে পড়বে, জেনে যাবে মানুষ আছে ভিতরে। এক ফোঁটা নীলুফার অবধি কেমন সব বুঝে ফেলেছে—ক্ষিধে পেলেও কাঁদে না, চুপচাপ ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

ঘরে কিছু মুড়ি ছিল, পানি ছিল কলসি ভরা—পুরো দিনরাত্রি কেটে গেল বাসি মুড়ি আর পানি খেয়ে। ভয় কিছু গা-সওয়া হয়ে এল। আর লায়লার তো ঐ রকম—সে বলে, কেউ না বেরোও আমিই রসুইঘরে গিয়ে চাল ফুটিয়ে আনি। শুকিয়ে মরতে হবে, তার চেয়ে কেউ এসে কেটে রেখে যাক মামুর মতো।

দিন দুয়েক পরে ঠিক দুপুরবেলা এক কাণ্ড। টিনের চালে যেন মানুষ। সন্তর্পণে পা ফেলছে—তবু যত সামান্যই হোক, আওয়াজ মাথার উপরে। সেই কোন হেলিকপ্টার থেকে তারে-বাঁধা ঝুড়ি নামাল নাকি চালের উপরে? দুঃসাহসী লায়লা একটুখানি জানলা খুলে উঁকিঝুঁকি দেয়। দেখা যায় না। খুট করে আস্তে আস্তে ওদিককার দুয়োর খোলে। আলিমের বউ ছুটে এসে তার হাত টেনে ধরল।

ছেড়ে দাও মামী। মানুষই ঠেকছে। ক'দিন এমন থাকতে পারবে? আমরা আছি কেউ জানে না। পুলিশই বা টের পাবে কি করে বল, উদ্ধার করবে কেমন করে? দেখতে দাও কী ধরনের মানুষ। সে-মানুষ আমায় দেখতে পাবে না।

চেনা মানুষ গো! রহমান খাঁ। এইখানে ছিল সে আর তার

ফুফা দু'জনে একটা খোপ নিয়ে। খাসি-পাঁঠার দোকান বাজারে। ভাড়া বেশি বলে কিছুদিন পরে চলে যায়।

রহমান খাঁকে দেখে আলিমের বউ বাইরে আসে। রহমানও খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে : সকলে জানে, রানীবাগান একদম খালি। তোমরা রয়ে গেছ এর মধ্যে ? এমনি হালে ? কী দিকদারি এই হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হয়ে—গরিব আমরা কোথায় যাই, কি খাই ? একলা আসি নি, দশজন আমরা। গোস্তর দোকান সকলের। বাজারের লাগোয়া বস্তিতে থাকতাম, সেখানে আর থাকা যাবে না। দিনের চেয়ে রাত্রে ভয় বেশি। সরাব খেয়ে হল্লা দিয়ে বেড়ায়। কি গতিকে কালকের রাত্রিটা কেটেছে, আজ থাকলে রক্ষে হবে না কোন রকমে।

যাচ্ছিল থানায়। গিয়ে পড়লে জান বেঁচে যাবে হয়তো। বেরিয়ে পড়েছে সেই কখন! লোকের নজর বাঁচিয়ে গলিঘুঁজি ভেঙে নানান ঘুরপথে এইটুকু আসতে এত সময় লেগে গেল। এবারে ট্রামরাস্তা। আর যাওয়া যাবে না, দশটা মানুষ একসঙ্গে তো নয়ই। রানীবাগানের একটা খোপে লুকিয়ে-চুরিয়ে খানিকটা সময় কাটানো যায় কিনা, সেইজন্যে মসজিদের গলিতে ঢুকে পড়েছে। একা রহমান পাঁচিল বেয়ে উঠল ভিতরের গতিক বোঝবার জন্যে; বাকি ন-জন বাইরে।

আলিমের বউ আকুল হয়ে বলে, না না, এখানে নয়। তুমি ধর্মবাপ রহমান খাঁ, আরও কত ছাড়া-বাড়ি আছে, এদিকে তাক কোরো না। জানাজানি হবে। আমার নীলুকে বাঁচাতে পারব না।

লায়লা তাড়া দেয় : চুপ কর মামী। মাথা ঠাণ্ডা কর। রহমান খাঁ ওদের ভিতরে রেখে থানায় চলে যাচ্ছে। জীপগাড়ি নিয়ে থানাওয়ালারা আসবে। পুলিশের জিম্মায় সকলে আমরা চলে যাব। তিন মেয়েলোক পড়ে আছি, এরা এই এতজন এসে পড়ল, তাই বা কত বড় ভরসা! আল্লাহর মেহেরবানি। এত ফরিয়াদ করছিলে, তিনি

এনে দিলেন। চাবি নাও রহমান, চারিদিক দেখেশুনে তবে তালা খুলবে।

সদর খুলে ন-জনকে ঢুকিয়ে দিল। রহমান খাঁ দাঁড়ায় না। বলে, চললাম। যেমন ছিল, বাইরে থেকে তালা দিয়ে যাচ্ছি। চাবি আমার কাছে থাক। সাঁজ না লাগতে এসে পড়ব।

লায়লা বলে দেয়, থানায় গড়িমসি করে তো ঝাউতলা রোডে মোবারক মুন্সিকে ফোন করে দি'ও ওখান থেকে। খবর পেলেই তারা এসে পড়বে।

প্রেম সিং বড্ড মনমরা হয়ে পড়েছে। লাহোর জেলায় ঘর—ঘরবাড়ি চুলোয় যাক, যা শোনা গেল, গ্রামের নিশানাই মিলছে না আর এখন। মানুষ মেরে গ্রাম পুড়িয়ে-জ্বালিয়ে দিয়েছে। ষাট-পঁয়ষট্টি জন নিয়ে বৃহৎ সংসার তাদের, তার মধ্যে একটি প্রাণীরও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

খালি ট্যাক্সি নিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছিল। দেখে, মসজিদের দেয়াল ঘেঁষে মানুষ দাঁড়িয়ে। দেয়ালের সঙ্গে মিলে নিশ্চিহ্ন হতে পারলে বেঁচে যায় যেন। অতগুলো জোয়ান মরদ অমন নির্জীবের ভাবে রয়েছে—এ-পাড়ার মধ্যে ওরা কোন্ জাতের মানুষ, সেটা কিছু বলে দিতে হয় না। গাড়িটা আড়ালে রেখে প্রেম সিং চুপিসারে দেখছে। কী সর্বনাশ, বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে নিল যে সবগুলোকে! একেবারে পাড়ার ভিতরে!

ট্যাক্সি চালানো মাথায় উঠে গিয়েছে প্রেম সিং-এর। ক্যাম্পে ছুটল সকলকে খবর দিতে। রানীবাগানে একপাল গুণ্ডা এসে ঢুকেছে—আবার বুঝি তেমনি কাণ্ড ঘটায়, আমাদের পাঞ্জাবে যা হয়ে গেছে। গুণ্ডারা তৈরি হয়ে এসেছে বিস্তর হাতিয়ারপত্র নিয়ে। কত লোক? বিশ-পঞ্চাশ তো হবেই। কী রকমের হাতিয়ার? বন্দুক-ছোরা বল্লম-সড়কি সমস্ত।

সকাল থেকে জোর গুজব, আজ রাত্রে এই তল্লাট চড়াও হবে। রেল-পুলের কাছে অগণিত লোক জড় হয়েছে, স্বচক্ষে দেখে এসেছে কারা নাকি। সঠিক সময় অবধি বলে দিচ্ছে—অষ্টমী তিথি, রাত একটা নাগাদ চাঁদ ডুবে যাবে—রাস্তার আলো তো জ্বলেই না আজকাল —থমথমে অন্ধকারে সেই সময়ে মার-মার কাট-কাট করে এসে পড়বে। প্রেম সিং-এর মুখে আবার এই পাড়ার ভিতরের ব্যাপার শোনার পর কিছুমাত্র আর সন্দেহ রইল না। রেলের পুল দিয়ে সামনাসামনি তারা ধেয়ে আসবে। আর এই একটা দল আগেভাগে এসে লুকিয়ে আছে, ঠিক সময়টিতে বেরিয়ে পড়বে পিছন দিক দিয়ে। খুবলাল এদের মধ্যে লড়াইয়ের ফেরত। সে মাথা নাড়ে: ঠিক ঠিক, সাঁড়াশি-ব্যূহ বলে একে। পাকা-মাথা কাজ করছে ওদের ভিতর। খুব সম্ভব মিলিটারি লোক আছে ওদের মধ্যেও।

কেউ বলে, পুলিশ ডাক। কতদিকে কত ডাক এখন পুলিশের —ডাকলেই আসবে কিনা! বলবে, একাজ সেকাজ, ওখানে যাব, এই করব। শতেক টালবাহানা। অনেকে আবার দুটো পয়সা করবার তালে ঘুরছে এই মওকায়। পয়সা ছাড়—সব কাজকর্ম শিকেয় তুলে অমনি তোমার পিছু ছুটবে। পুলিশের ভরসায় থাকলে হবে না। পুলিশ করে ঘোড়ার ডিম।

লড়াই-ফেরত খুবলাল আস্ফালন করে: কাউকে লাগবে না। চোখ মেলে শুধু কাজকর্মগুলো দেখে যাও। মচ্ছব তো সেই রাত দুপুরে, সাঁড়াশি-ব্যূহের পিছন-হাত তার আগে বেমালুম ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে। হৈ-চৈ কোরো না, কোন চিন্তা নেই।

রানীবাগানের সামনে-দেওয়া তালাটা অতি নিঃশব্দে ভেঙে ফেলল। দলবল সতর্ক হয়ে এগুচ্ছে। সরু এক উঠানের ফালি —অত মানুষ ঢোকবার জায়গাই বা কোথা? বন্দুক বাগিয়ে বলে, হাত তোল। নড়াচড়া করবে না। যেমন আছ, ঠিক তেমনি থাকবে।

দাওয়ায় গুঁটিসুটি হয়ে আছে গোস্তওয়ালা ক'টি। টর্চ ফেলেছে তাদের উপর। কুক ছেড়ে তারা কেঁদে উঠল।

চুপ!

গর্জন শুনে সঙ্গে সঙ্গে একেবারে নিঃশব্দ। সাঁড়াশি-ব্যূহের সৈন্যবাহিনী যদি হয়, অতিশয় সভ্যভব্য সৈন্য। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, তোবড়ানো টিনের সুটকেস কিংবা ছেঁড়া গামছার পুঁটলি। একজনের সঙ্গে একটা তামার বদনাও দেখা গেল। খুবলালের দল রণজয় সম্বন্ধে ষোলআনা নিঃসংশয় এতক্ষণে।

ঠক ঠক করে কাঁপছে তারা ভয়ে: আমরা কিছু করি নি, কোন ঝামেলায় নেই। গোস্ত বেচি, সকলের ফাইফরমাশ খাটি। ছেড়ে দাও, ঘরে চলে যাব। আর কোনদিন আসব না।

ভয় কেটে গিয়ে এখন এরা খলখল করে হাসছে: কষ্ট করে যেতে হবে কেন? আমরাই পৌঁছে দেব। কোন দিন আর আসতে হবে না।

হাতে বন্দুক আছে, কিন্তু বন্দুকে আওয়াজ হয়। পুলিশ এসে পড়তে পারে। খরচাও বটে। বুলেটের মন্বন্তর, জোটানো বড় মুশকিল। এদের বেলা প্রয়োজনও নেই তার। বন্দুক বড় বড় কাজের জন্য।

আকাশ-ফাটা আর্তনাদ ওদিকে, জানে মেরো না, দয়া কর—

দয়াই তো করি আমরা। জবাই করি নে তোদের কসাইয়ের মতন—এক কোপে সেরে দিই। টেরই পাওয়া যায় না।

ওদের সেই ছোট ছেলেটা হাউহাউ করে কাঁদছে। তাড়া দিলে শোনে না। তখন মিষ্টি কথা: তোর কিছু হবে না। কথা শোন, চুপ করে শুয়ে পড় ওখানটা।

ভাসা-ভাসা দুটো চোখে বক্তার দিকে চেয়ে কি বুঝে ছেলেটা শুয়ে পড়ল।

হ্যাঁ, চোখ বোঁজ। তাকিয়ে দেখিস নে, কোন ভয় নেই।

চোখও বুজল সত্যি সত্যি। কোমরের চকচকে কৃপাণ প্রেম সিং-এর হাতে উঠেছে। লাফাচ্ছে সে উন্মাদের মতো। বদ্ধ উন্মাদ —সুস্থ লোকে এমনধারা পারে না। খুন চেপে গেছে। রক্তাক্ত কৃপাণ ঘোরায় আর চেঁচায়: খুনকা বদলা খুন! লাহোরের বদলি, আমার মা-বাপের জান নেবার বদলি, ভিটেমাটি উচ্ছেদের বদলি।

আর অদূরে খোপের ভিতরে ওরা সকলে আবিষ্টের মতো বসে আছে। আলিমের বউ ঢপ করে মাটিতে পড়ে গেল—তার নীলুফার ঠিক ঐ ছেলেটার বয়সি। গোঙাচ্ছে। বউয়ের ফিটের ব্যারাম—সময় বুঝে এখনই ব্যারাম চাগাল।

আরও আছে রে, এই ক'টা শুধু নয়। ঘরের মধ্যে ঢুকে রয়েছে মানুষ।

সামনের লোকেরাই বীরত্ব দেখাচ্ছে এতক্ষণ। বেকার যারা পিছনে ছিল, রে-রে করে ছুটল ঘরের দিকে। শোলার সাজের মতো ঘরের বন্ধ দরজা এক ধাক্কায় চুরমার। পাঁচ-সাতটা টর্চ পড়েছে।

দাওয়ার দিক থেকে পিছনের লোকেরা প্রশ্ন করছে, আছে কিছু ওখানে?

ইঁদুর। কিচকিচ করছে। আসতে হবে না তোমাদের। লাঠিতেই হয়ে যাবে।

দমাদম লাঠির আওয়াজ। খুব পিটছে। গোড়ায় একটু-আধটু ভিন্ন রকম আওয়াজও ছিল। মুহূর্তে ঠাণ্ডা। এখন কেবল লাঠি-পেটার শব্দ। লাহোরের শোধ কলকাতা শহরে। লায়ালপুরের শোধ, গুজরানওয়ালার শোধ। কেমন—কেমন—কেমন?

হুইসল বেজে উঠল এমনি সময়ে দু'বার। সঙ্কেত: সরে যেতে হবে সকলের, একজনও আর ওখানটা থাকবে না। মসজিদের মুখে খুবলাল স্বয়ং দাঁড়িয়ে নজর রাখছিল, সে হুইসল দিয়েছে। আবর্জনা

আঁস্তাকুড় কাঁচা-ড্রেন মেথরের যাবার রাস্তা—যে যেদিক দিয়ে পারে, সুড়সুড় করে বেমালুম গায়েব হয়ে গেল।

স্বয়ং এ. সি. অর্থাৎ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার দলবল নিয়ে এসে পড়েছেন থানা থেকে। দু'খানা জীপ, রহমান খাঁ সঙ্গে। গিয়ে পৌঁছেছিল তবে রহমান খাঁ, সঙ্গে করে নিয়েও এসেছে!

গোলমালের খবর পেয়ে কেষ্ট মিত্তিরও ঠিক সময়টিতে চলে এসেছে মিত্র-সংঘের ছেলেদের নিয়ে। উঁকি মেরে দেখে এসে হায়-হায় করছে। বুক চাপড়াচ্ছে: সেই সেই এলেন স্যার, আর খানিক আগে যদি পৌঁছতেন। আমরাও খবর পেলাম অনেক পরে। কিছু আর করবার নেই, সমস্ত খতম।

এ. সি. বললেন, কি করা যাবে! লোকটা বসেও ছিল অনেকক্ষণ। তাগিদ দিচ্ছিল। কিন্তু ফুরসত পেলে তো! পাড়ায় পাড়ায় একেবারে এক সঙ্গে লেগেছে। সর্বক্ষণ ছুটোছুটি, তবু পেরে ওঠা যাচ্ছে না। চলুন, এক নজর দেখে আসি। এক ঞচ্ছব সমস্ত জায়গায়। কী করা যাবে বলুন।

থানার গাড়িতে সুরেশ এসেছে এঁদের সঙ্গে। নরেশ ডাক্তারের ভাই—বাগবাজারের সুরেশ। লাহোরের চিঠি পৌঁছে গেছে অবশেষে। বিস্তর পথ ঘুরে পোস্ট-অফিসের শিলমোহরের ঘা খেতে খেতে চিঠি এসে পৌঁছল, ইতিমধ্যে গোটা কলকাতা শহর দুই তরফের বীরবৃন্দ নানান দুর্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। লীলার খোঁজে পার্ক স্ট্রীট যাবে—যাওয়ার উপযুক্ত তোড়জোড় করতেই দুটো দিন কেটে গেল। তারপর দলবল জীপগাড়ি ও বন্দুক নিয়ে সমারোহে ঠিকানায় হাজির হল—কিন্তু কোথায় হস্টেল, কোথায় বা কি! ঘরদুয়োর হাঁ-হাঁ করছে। একদা মেয়েদের বসতি ছিল, তার কিছু পরিচয়চিহ্ন ছড়ানো—চুলের ফিতে, পাউডারের খালি কোটো, হিল-তোলা একপাটি জুতো—এই সব। ফুটপাথের ও-পারের স্টেশনারি দোকানের লোকটার কাছে জানা গেল, মরে নি কেউ,

হানা দেবার আগেই সব সরে পড়েছিল। সেই লোকটাই আন্দাজি এই পাড়ার কথা বলল, তিনটে ট্যাক্সি এই দক্ষিণমুখো ছুটতে দেখেছে। সুরেশ তখন সরাসরি থানায় এসে উঠল—যা-কিছু পাকা খবর এঁদেরই কাছে তো আজকাল।

এ. সি. সুরেশের পরিচয় দিয়ে দিচ্ছেন: ভদ্রলোক ডাক্তার, নর্দার্ন রিলিফ-স্কোয়াডের সঙ্গে কাজ করেন। স্কোয়াডের গাড়ি এঁকে থানায় পৌঁছে দিয়ে গেল। পার্ক স্ট্রীটে এঁর আত্মীয়া থাকতেন। শুনে এলেন, হস্টেলের অনেক মেয়ে এই এলাকায় কোথায় নাকি এসে উঠেছেন। আরে, আমাদের কি মাথার ঠিক আছে—খোঁজখবরের সময়ই বা কোথা? আমি আপনার কথা বললাম, কেউ যদি পারেন সে আমাদের কেষ্টবাবু। এখান থেকে আপনাদের সংঘের অফিসে নিয়ে যেতাম। ভাল হল, সেই অবধি আর যেতে হল না।

আরও ফলাও করে বলছেন, কর্মবীর মানুষ এই কেষ্টবাবু—দশের কাজে দিনরাত পড়ে আছেন। গোটা তল্লাট এঁদের নখদর্পণে। আমাদের বড় সাহায্য করছেন। কেষ্টবাবুরা না থাকলে আরও যে কী হত বলতে পারি নে।

কেষ্ট মিত্তির ঘাড় নেড়ে আর্তকণ্ঠে বলে, লজ্জা দেবেন না স্যার। বাড়ির কাছে—বলতে গেলে উঠোনের উপর—এত বড় কাণ্ড! ঘুণাক্ষরে যদি টের পেতাম, কারো বাপের ক্ষমতায় হত না কিছু করে যাবার। হায় হায়, আমাদের মুখ দেখাবার উপায় রইল না!

বাড়ির ভিতরে চললেন সকলে। রিলিফের কাজে ঘুরে ঘুরে এই ক'দিনে সুরেশ অনেক দেখেছে, তবু কিন্তু সর্বদেহ তার হিম হয়ে যায়। নিচু দাওয়ার উপরে এবং সঙ্কীর্ণ উঠানটুকুতে গোণাগুণতি ন-টা লাস। একটা তো একেবারে দরজার কাছে এসে পড়েছে। হয়তো পালাচ্ছিল, কিংবা পা ধরে বাঁচবার জন্য ছুটে এসেছিল এগিয়ে।

রক্ত পড়া একেবারে বন্ধ হয় নি, দেহে হয়তো বা এখনও উত্তাপ পাওয়া যাবে।

একজনে বাতলে দিল, ঘরের মধ্যেও আছে গোটা কয়েক।

ঘরে অন্ধকার জমজমাট। মেজের উপর টর্চ ঘুরিয়ে তবে দেখা গেল। বুড়ি আলিমের মা আশি বছর অবধি নিজের জায়গার দেমাক করে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। আলিমের বউয়ের কোলে জড়ানো নীলুফার। আর লায়লা।

কেষ্ট মিত্তির আর্তনাদ করে ওঠে : অ্যাঁ, আলিম-দার বাড়ির ওঁরা যে! পাড়া ছেড়ে চলে গেছেন, শুনেছিলাম। মরতে পড়ে ছিলেন এই জায়গায়?

দেখেশুনে বেরিয়ে এসে এ. সি. সিগারেট ধরালেন : চললাম। রথতলা হয়ে সোজা নকুলবাবুর বস্তি। সেখান থেকে মতি দপ্তরি লেন। তারপর আর যেখানে খবর হয়।

কেষ্ট মিত্তিরকে একটা সিগারেট দিলেন। একান্তে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে বললেন, পারেন তো সরিয়ে দিন মশায়। দেখতে জঘন্য। ঠেলা-গাড়িতে চাপিয়ে ছেলেরাই তো ফেলে আসতে পারে। আমরা কাঁহাতক চালান দিয়ে পারি? সমুদ্দুর থেকে ক'ঘটি আর জল সরাব? জায়গাও নেই কোন লাস-ঘরে। চাউলপটিতে দেখে এলাম, বেমালুম লাস ভাসিয়ে দিচ্ছে। ওদের ভারি সুবিধে —একেবারে খালের উপর কিনা!

কেষ্ট বলে, তার ভোগান্তি অন্য লোকে নিচ্ছে। মড়ি পচে থিকথিক করছে। গন্ধে মানুষজন খালমুখো হতে পারে না।

পুলিশের জীপগাড়ি বেরিয়ে গেল, রহমান খাঁ গেল ঐ সঙ্গে। আর কী গরজ—দলবলের জন্য ছুটোছুটি করছিল, তাদের গতি হয়ে গিয়েছে।

জীপ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেষ্ট মিত্তিরের ভিন্ন মূর্তি। নিশ্বাস

ছেড়ে বলে, যাক বাবা, হাঙ্গামা চুকল। সবগুলো সাবাড় নাকি রে? দেখ দিকি ভাল করে।

সব—সব—

বুঝিস। সাপ ঘাঁটা দিয়ে ছাড়ে না। ফণা তুলে ছোবল মারে। বেটাদের বিশ্বাস নেই। বরঞ্চ একটু-আধটু খুঁচিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আয়। বেঁচে থাকলে সাক্ষিতে হয়তো পাড়াসুদ্ধ জড়িয়ে দেবে। জড়াচ্ছেও কত এমন!

অজানা ভদ্রলোক রয়েছেন, সেটা হুঁশ ছিল না। বলে ফেলে কেষ্ট মিত্তির বেকুব হল। তবে একজাতের লোক এই যা—দাঙ্গা হয়ে এই সুবিধা হয়েছে, জাতভাইয়ের কাছে মন খুলতে বাধে না। তা ছাড়া ভদ্রলোক তো পার্ক স্ট্রীটের নিখোঁজ আত্মীয়ার তল্লাশ করে বেড়াচ্ছেন। মন-মেজাজ অতএব উষ্ণ, এক ব্যথার ব্যথী, ষোল আনা এখন এই দলের।

বলে, বলুন আপনার কথা। মেয়েটি বুঝি হস্টেলে থাকতেন? কতটা কি শুনে এলেন, বলতে বলতে আসুন।

সংঘের অফিসে নিয়ে চলেছে সুরেশকে। লাহোরের কথায় কেষ্ট মিত্তির চমকিত হল। যে-কেউ শোনে, সে-ই অমনি হবে। বলে, সেইখানে আছেন আপনার দাদা? আরে সর্বনাশ! খবরের কাগজে তো যা-তা লিখছে লাহোরের অবস্থা নিয়ে। কলকাতা তার কাছে একেবারে নস্যি। তা চিঠিতে কি লিখছেন বলুন দিকি? তাঁরা তো প্রত্যক্ষদর্শী।

দু-হপ্তা আগের সেসব চিঠি। এখন কোথায় তাঁরা, তাই তো জানা যাচ্ছে না। টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম যাচ্ছে, জবাব নেই। অমৃতসরে দাদার এক বন্ধুকে লিখলাম—খোঁজটোজ নিয়ে তিনি জেনেছেন, হাসপাতাল ছেড়ে তাঁরা সব বেরিয়ে পড়েছেন। এই অবধি—তার পরের খবর কেউ বলতে পারে না।

কেষ্ট মিত্তির বলে, তবে দেখুন। আক্রোশটা তবে অন্যায়

বলবেন কিসে? হ্যাঁ, মশায়, আপনাদের ওদিককারও তো খুব নাম। জোড়াঘাটে নাকি জবর একখানা ঝেড়েছেন আপনারা!

বিতৃষ্ণায় সুরেশের মন ভরে যায়। থানার লোক এই মানুষকে কেষ্টবিষ্টু ভেবে রেখেছে! স্পষ্টাস্পষ্টি দাঙ্গাবাজগুলো অনেক ভাল এদের চেয়ে। বলে, ডাক্তারি পাশ করেছি, রিলিফ-স্কোয়াডের লোক আমি। আমার কাছে ও-সব বলবেন না। আমার কাজ মানুষ বাঁচানো, মানুষ মারা নয়।

ঠিক ঠিক! আমরাও তাই। মিত্র-সংঘের কথা শুনেছেন, সেই আমরা।

ফিকফিক করে হাসতে লাগল কেষ্ট মিত্তির। বলে, পার্ক সার্কাসে ওরাও নাকি বিস্তর সংঘ-সমিতি করেছে। মিত্র-শত্রু নির্বিশেষে সেবা—মহান আদর্শ! রুইকাতলা থেকে চুনোপুঁটি অবধি আচ্ছা-আচ্ছা বুলি কপচায়। হেসে আর বাঁচি নে মশায়। কারা তবে এই সব করে যাচ্ছে? বনের বাঘ-ভালুক, আকাশের জিনপরী?

নয়

তবে সুরেশের জন্য অনেক করল কেষ্ট মিত্তির। পাঁচ-ছ জায়গায় নিয়ে গেল সঙ্গে করে। উইমেনস হস্টেলের মেয়েও পাওয়া গেল, কিন্তু লীলা দত্তের খবর কেউ বলতে পারে না। রাত হয়ে গিয়েছে, এখন আর কিছু হবে না। আবার ফিরে এসেছে পাড়ার মধ্যে।

কেষ্ট মিত্তির বলে, কাল আবার দেখব। কোনরকম হদিস পেলে আপনাকে জানিয়ে দেব। আমাদের লোক গিয়ে খবর দিয়ে আসবে। কিন্তু রাত্রে এখন ফিরে যাবেন নাকি?

সুরেশ বলে, তাই তো! স্কোয়াডের গাড়ি চলে গেছে, যাই কিসে এখন?

কেষ্ট মিত্তির বলে, ট্যাক্সি করে যাওয়াও ঠিক হবে না। রেডিও-অফিসের একজনকে ট্যাক্সিতে তুলে খুন করে ফেলে গেল, তা-ও তো হয়েছে। ট্যাক্সি পাচ্ছেনই বা কোথা?

সুরেশ একটু ভেবে বলল, এক মাস্টার মশায় আছেন কাঁসারি-পাড়ার মেসে। আমার ভাইঝিদের পড়াতেন এক সময়। একদিন তাঁর মেসের সামনে হঠাৎ দেখা। খুব টানাটানি করলেন। ভাবছি, সেইখানে গেলে কেমন হয়?

ঘাড় নেড়ে কেষ্ট বলে, তাই চলে যান মশায়। রাত্তিরবেলা গোঁয়ার্তুমি করা ঠিক নয়। কলকাতায় এই একটিমাত্র পাড়া—নির্ভাবনায় যেখানে ঘুমতে পারবেন। পালা করে সমস্ত রাত মিত্র-সংঘের আমরা টহল দিয়ে বেড়াই। একটা কথা শুনে রাখুন—সমস্ত শহর পুড়ে-জ্বলে ছাই হয়ে যাবে, আমাদের এলাকায় কিছু হবে না। এত শক্তি ধরি আমরা।

মানুষটা যত খারাপই হোক, পরের জন্য কিন্তু করে। সদ্য-চেনা একজনের সঙ্গে এত ঘোরাঘুরির কি গরজ পড়েছিল? হাঙ্গামার কথা যদি ধরেন, দিনকাল তো এই হয়েছে। মানুষে মানুষে অপ্রত্যয়—দুনিয়ার যেন নিয়ম। রকমারি চেহারা তার, নানা সুড়ঙ্গপথে আনাগোনা। জগৎ কুড়িয়ে সুস্থ-স্বচ্ছন্দ যে ক'টি মানুষ, তাদের বোধকরি আঙুলে গণে ফেলা কঠিন হয় না।

কেষ্ট মিত্তির হঠাৎ বলে, সাহস আছে কি রকম মশায়?

কি ভেবে বলছে বোঝা যায় না। আবার বলে, বলুন না। এই রাজারে রিলিফ করে বেড়ান কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

ভীতু নই।

ভূতের ভয় করে না তো? রাত্তির হয়েছে, সেটাও বুঝে দেখুন।

কেষ্ট মিত্তিরের বলার ধরনে সুরেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

বলে, মড়া কাটতে হত আমাদের। লাস-ঘরের পাশের ওয়ার্ডে ডিউটি দিতে হত সারারাত।

এ-ও লাস-ঘর বটে। চলুন। একলাই যেতাম। কিন্তু দিনকাল খারাপ—আপনাকে পাচ্ছি তো ভেবে দেখলাম, একজন সাথী নিয়ে যাওয়াই ভাল।

বলবার ঢঙে রহস্যের আভাস। সুরেশ বলে, কোথায় যাচ্ছি বলুন তো? কদ্দূর? মানে, মাস্টার মশায়ের মেসে যাব তো, খুব বেশি রাত হলে মুশকিল।

কেষ্ট হেসে বলে, ওসব নয়—ভয় হচ্ছে, সেই কথাটা খুলে বলুন। তা চলেছেন যখন, আমারই বা বলতে কি! কাছেই যাচ্ছি। রানী-বাগানে—যেখানটা পুলিশে আপনাকে পৌঁছে দিয়েছিল, মানুষ মরে সারি সারি সেই যে পড়ে আছে।

আবার বলে, টর্চ নিভিয়ে দিন। রাস্তায় জ্বালবেন না। আশপাশের বাড়ি থেকে দেখছে। সবাই চেনে আমায়। ভাববে, কেষ্ট এই রাত্রে যায় কোথায়?

টর্চ নিভিয়ে সুরেশ বলে, আমিও তাই ভাবছি। এই রাত্রে লুকিয়ে-চুরিয়ে আবার সেখানে যাবার গরজটা কি হল?

চুপচাপ চলল দু'জনে কয়েক পা। কেষ্ট মিস্তির তারপরে জবাব দেয়, দেখতে পাবেন এখনই। দেখতে পেলে কে শুনতে চায়? ওই লোকগুলো হানা দেবার মতলবে পাড়ায় ঢুকেছিল। খালি হাতে হানা দিতে আসে না, বুঝতেই পারছেন। সেইসব মালের খোঁজে যাচ্ছি। পুলিশ আমাদের খাটিয়ে নেয়, কিন্তু বিশ্বাস করে না। তারা চায়, আমরা খালি হাতে ডন কষে বেড়াই। বিচার দেখুন। জান দিয়ে তো খাটব, সেই জান ঠেকাবার উপায়টা কি? আমরাও সেইজন্যে যা যেখানে জোটে হাতড়ে নিয়ে আসি। ব্যাপারটা আবার চাউর হতে দেওয়া যায় না, পুলিশে টের পেলে তক্ষুণি তল্লাশি করে সমস্ত নিয়ে নেবে। চুপিসারে তাই যাচ্ছি।

চলেছে। রাস্তায় আলো নেই। থমথম করছে চারিদিক। শহর কে বলবে? ছিল হয়তো কোন একদিন। নরনারীর চলাচলে হাসিহল্লায় গাড়ির ভিড়ে এই রাস্তায় চলা যেত না। সে যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা—কোন রাক্ষসে নিঃশেষ করে খেয়ে গিয়েছে। প্রেতপুরীর মধ্যে দুটি প্রাণী—তারাও যেন আর এই লোকে নেই।

রানীবাগানে ঢুকতে গিয়ে কেষ্ট মিত্তির সামাল করে: দেখে শুনে ভাই, মাথা নিচু করে। ঠোক্কর খাবেন।

হঠাৎ গলা আরও নিচু করে বলে, মাল নিয়ে এসেছেন তো সঙ্গে?

সুরেশ তাকাল তার মুখের দিকে। কেষ্ট বিরক্ত হয়ে বলে, কী আশ্চর্য, এতক্ষণেও মাল বুঝলেন না? যার খোঁজে এসেছি এখানে। ছোরাছুরি নয়, কিছু পিস্তল-বন্দুক। রিলিফের কাজে ঘুরছেন, পার্ক স্ট্রীট অবধি ঘুরে এসেছেন, মাল সঙ্গে নেই—বলেন কি মশায়?

মালকোঁচা-মারা ধুতি, ঝোলানো শার্ট। শার্ট উঁচু করে তুলে কেষ্ট কোমরে-গোঁজা পিস্তল দেখিয়ে দিল: এই দেখুন মাল। আর আপনি মশায় নিঃসম্বলে বেড়াচ্ছেন শুধু শুধু ঐ বড় ব্যাগটা বয়ে?

সুরেশ বলে, ব্যাগে কিছু ওষুধপত্তর আছে, ফ্লাস্কে আছে জল। বলেছি তো আমাদের কাজ মানুষ বাঁচানো। বাঁচানোর মাল সঙ্গে থাকে আমাদের; অন্য মালের গরজ নেই।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কেষ্ট বলে, যান যান। বচনে চিঁড়ে ভিজবে না। স্মৃতীশ বাড়ুয্যেরা বুক পেতে ভাল ভাল শ্লোগান দিয়ে এগোচ্ছিলেন। তা বলে কেউ রেহাই করল? সে-ও ঐ পার্ক স্ট্রীটে। কপালজোরে আপনি ফিরেছেন। এমন বেকুবি কদাচ আর করবেন না, খবরদার। মুখে দেদার হিতকথা বলে যাবেন, কথার উপরে ট্যাক্সো নেই। কাপড়ের নিচে কিন্তু পিস্তল।

দাওয়ায় একটা লাসের মাথার কাছে গামছার পুঁটলি। উবু হয়ে বসে কেষ্ট মিত্তির অতি-সতর্ক ভাবে পুঁটলি খোলে। মিলের নতুন শাড়ি, শিশুর উপযোগী হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি। আর গালার চিরুনি—ফুটপাথে চার পয়সা ছ-পয়সায় যা বিক্রি হয়। খেলো জিনিস সমস্ত। কবে কিনে রেখেছিল, অতি-বড় সঙ্কটের মধ্যে পুঁটলি তবু ফেলে আসে নি। বাড়ি ফেরা যদি ঘটেই, শুধু হাতে গিয়ে দাঁড়াবে না।

দূর! বলে কেষ্ট মিত্তির বাঁ-হাতে ঠেলে দিল ঐসব। যা খুঁজছি, সেসব কোথা?

টিনের স্যুটকেসটার দু-দিকে দুটো তালা। তালার বহর দেখে আশা হয়, এর মধ্যে কিছু মিলতে পারে। আলিমের মা বুড়ির সুপারি-কাটা জাঁতিখানা পাওয়া গেল। জাঁতির মাথা ঢুকিয়ে চাড় দিতে—কোন মান্ধাতার আমলের জিনিস—কব্জা খুলে পড়ল। করত মাংসের দোকান—কিন্তু দেখুন দিকি, লোকটা আস্ত এক শুভঙ্কর ভিতরে ভিতরে। লাল খেরোয়-বাঁধা অতিকায় জাবেদা খাতা। দোকান খোলার পয়লা রোজ ইলাহি ভরসা লিখে হিসাব ধরেছে, তাবৎ কালের মধ্যে বিড়ির খরচ আধেলা পয়সাটাও বাদ পড়ে নি। কোন উপরওয়ালার জন্যে প্রতিটি দিনের হিসাব রেখে চলে গিয়েছে। আর চিঠিপত্রের গাদা, পোস্টকার্ডই প্রায় সমস্ত, যেখান থেকে যা-কিছু এসেছে, সমস্ত রেখে দিয়েছে। আর যা-কিছু ছিল, ফেলে এসে বাক্সবন্দি শুধু কাগজের গাদা বয়ে বেড়াচ্ছিল লোকটা।

টর্চ ধরে আছে সুরেশ। চেয়ে চেয়ে দেখে সে আঁতকে ওঠে। কী রকম কুপিয়েছে দেখ! মাথায় মেরেছে, বুকে মেরেছে, হাতে পায়ে মেরেছে, তারপরে গলাতেও কোপ ঝেড়েছে। মানুষের দেহ যেন কলা-কচুর ঝাড়, হাতের সুখ করতে কুপিয়ে গেলেই হল। অথবা শতেক প্রাণ বুঝি এক মানুষের—কোন দিকে কোন্-একটা

টিকে না থাকে, সকলগুলো শেষ করা চাই। এর পরেও কিনা কেষ্ট মিত্তিরের সন্দেহ, ধূলো ঝেড়ে উঠে পড়ে হাকিমের এজলাসে গিয়ে সাক্ষিতে হয়তো বা পাড়াসুদ্ধ জড়িয়ে দেবে। সঙ্গীদের তাই খুঁচিয়ে পরখ করে দেখতে বলে। মিত্র-সংঘের বহুদর্শী সেক্রেটারি এই কেষ্ট মিত্তির।

কাগজপত্র ঝেড়েঝুড়ে দেখে কেষ্ট গজর-গজর করছে: যত ভুষিমাল। আসল বস্তু কি হয়ে গেল?

ব্যঙ্গের সুরে সুরেশ বলে, ঝানু লোক তো আপনি, অনেক দেখেছেন। লড়াইয়ের সিপাহি এদের কোন বিবেচনায় ঠাওরালেন শুনি? পুঁটলি দেখেও বুঝলেন না?

কেষ্ট বলে, পিস্তল-বন্দুক না হোক, টাকা-পয়সা থাকবে তো কিছু! দেশে-ঘরে কি খালি হাতে যাচ্ছিল? তাই বা উড়ে গেল কোথায়?

সেই খোঁজে লাস হাতড়াচ্ছে। যেটা কাত হয়ে পড়েছিল, জুতোর আগায় ঠেলে ঠেলে চিত করে দিচ্ছে। কোমর টিপে গাঁট খুলে দেখছে। সুরেশের উপর খিঁচিয়ে ওঠে: টর্চ ঠিক করে ধরুন মশায়, নড়াবেন না। আলো এদিকে-ওদিকে পড়ছে।

পাচ্ছেও দু-পাঁচ টাকার নোট। একুনে পঁচিশ-ত্রিশ হল বোধহয়। টুকটাক করে নোট খুঁটে নেওয়ার যে ব্যাকুলতা—এইটে আসল, এতক্ষণে পরিষ্কার বোঝা গেল। সুরেশের গা ঘিনঘিন করে। কী লোকের সঙ্গে পাকেচক্রে এ কোথায় এসে পড়ল! শ্মশানঘাটে মড়া পুড়িয়ে চলে গেলে ডোমেরা যেমন খোঁজাখুঁজি করে পয়সাকড়ি ছিটকে পড়েছে কি না কোথাও। খই পড়ে আছে কি না। কাপড়-চাদর কি মাদুর-কাঁথা কোন দিকে ফেলেছে। শিয়াল-শকুনে খোঁজে হাড়গোড় কতটা কি পড়ে রইল। ঠিক সেই ব্যাপার।

সুরেশ বলে উঠল, আমি যাই। আর সইতে পারছি নে।

কেষ্ট উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি বলে, আর একটুখানি। ঘরের ভিতরটায় একবার নজর বুলিয়ে চলে যাই। আলিমের বাড়ির সব ওখানে। আমরা আলিম-দা বলতাম। ভাল ঘরের ছেলে—এসব জায়গায় থাকবার মতো নয়। কিন্তু খেয়ালি মানুষ—বাড়ি বেচে দিয়ে এখানে উঠল। কিছু টাকা হাতে এসেছিল সেই সময়। সে টাকা সব যে সরাতে পেরেছে, মনে হয় না। এত হাঙ্গামা-হুজ্জুত—বুঝতেই পারছেন, সংঘ চালাতে আমাদের টাকার বড় দরকার। টাকা থাকলে আরও কত রকমের কাজ করতে পারতাম!

ঘরে পা দিয়ে সুরেশ টর্চ নিভিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়াল।

হল কি মশায়?

মেয়েলোক, ভাল ঘরের মেয়ে। এখানেও জুতো দিয়ে ধাক্কাধাক্কি করবেন, সে হবে না।

কেষ্ট মিত্তির দাশনিক ভাবে বলল, মড়া তো! মড়ার আবার মেয়েপুরুষ কি?

সুরেশ তিক্ত কণ্ঠে বলে, আপনি যে রকমের লোক—ছাড়বেন না সে জানি। কিন্তু আমার সামনে নয়। চোখ মেলে আমি দেখতে পারব না।

কেষ্ট বলে, এ কি, অন্ধকারে ফেলে রেখে সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছেন যে?

সুরেশ দাঁড়ায় না, বেরিয়ে পড়ল। গলিতে এসে পড়েছে। পিছন পিছন কেষ্ট। কৈফিয়তের ভাবে সে বলে, নতুন মানুষ আপনি —কি ভাবছেন জানি নে। কিন্তু আলিমদা-ও সংঘের একজন। জানতাম না যে ওঁর বাড়ির লোক পড়ে আছেন এখনো। তা হলে জীবন দিয়ে আমরা রুখতাম। বাইরের কারা এসে মেরে ধরে গেল। টাকাকড়ি কদ্দূর কি নিয়ে গেছে জানি নে—কিন্তু ওদের টাকার কেউ যদি হকদার থাকে, সে হল মিত্র-সংঘ।

সুরেশ বলে, বলছি তো তাই। যা করবার সংঘের মানুষ ডেকে এনে করবেন। আমি কেন এর মধ্যে থাকব ?

কেষ্ট চটে গেছে। বলে, আনব বই কি ! কেষ্ট মিত্তিরের এক ডাকে এক্ষুণি বিশটা ছোঁড়া ছুটে আসবে। এসে পড়েছিলাম, তাই ভাবলাম কাজটা চুকিয়ে যাই একেবারে। বেশি জানাজানি হতে দেওয়াও ঠিক নয়। টর্চ নিয়ে মশায় তো ফরফরিয়ে বেরিয়ে এলেন। কাজ তা বলে আটকে থাকবে না, জেনে রাখুন। সকালবেলা বার শালা এসে পড়বার আগেই আমাদের কাজ ফয়তা হয়ে যাবে। কিছু পাবে না—কপাল চাপড়াবে তারা এসে।

দশ

কথা না বাড়িয়ে সুরেশ হন-হন করে কাঁসারিপাড়ার দিকে চলল। মোড় ঘুরে কেষ্ট মিত্তিরের আড়াল হয়ে থমকে দাঁড়ায়। হাতঘড়ি দেখল। দশটা। মাস্টার মশায়ের সঙ্গে যত খাতিরই হোক, এর পরে মেসের দরজার কড়া নাড়া ঠিক হবে না। মানুষজন আতঙ্কগ্রস্ত —হয়তো বা পাড়াসুদ্ধ হৈ-হৈ করে উঠবে। এমনি সব ভাবছে সুরেশ। কিন্তু ভয় ধরিয়ে গেল যে কেষ্ট মিত্তির ! রাত পোহাবার আগেই সংঘের দলবল নিয়ে আবার গিয়ে পড়বে। কাঁসারিপাড়ায় না গিয়ে সুরেশের পা দুখানা যেন আপনি চলে যায় আবার রানীবাগানে, রক্তাক্ত দাওয়ায় বীভৎস লাসগুলো যেখানে পথ আটকে পড়ে রয়েছে। লাস ডিঙিয়ে সামাল হয়ে ঢুকতে হয় ঘরের মধ্যে। মা আর শিশু জড়াজড়ি হয়ে মাঝখানটায়। কোণের দিকে বুড়ি মানুষটা। পানের ডাবর কাত হয়ে গড়াচ্ছে। আর ওপাশে— কই, নেই তো ! কোথায় গেল সেই মেয়ে ?

লহমার দেখা বটে, চোখ তাহলে ভুল দেখে নি। ঘরের মধ্যে পা

দিয়েই দেখেছিল, মেয়েটার মুঠো-করা হাত খুলে গেল। আর মনে হল, চোখ পিটপিট করছিল—চোখ বুজে গেল অমনি সঙ্গে সঙ্গে। কেষ্ট মিত্তির পিছনে ছিল, সে টের পায় নি। নিমেষমাত্র দেখেই সুরেশ তাই টর্চ নিভিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। মিত্র-সংঘের পাকাপোক্ত সেক্রেটারি কেষ্ট মিত্তির এবং কোমরে তার পিস্তল—টের পেলে ভবিষ্যতের সাক্ষ্য সম্বন্ধে খুব সম্ভব সে নিশ্চিত হতে চাইত। আলো নিভিয়ে তাই সুরেশ অমন করে বেরিয়ে পড়েছিল।

সেই মেয়ে ইতিমধ্যে মরণশয্যা থেকে উঠে পালিয়ে গিয়েছে। ভাল। খুব ভাল। সংঘের লোকেরা খোঁজাখুঁজি করতে আসছে অনতিপরেই। খুঁজবে অবশ্য টাকাকড়ি জিনিসপত্র কোথায় কি পড়ে আছে—মানুষের চেয়ে যার ঢের ঢের বেশি দাম। কিন্তু ঘরের চারটে মড়ার মধ্যে একটা গায়েব হয়ে গেল, তার জন্যেও তন্নতন্ন করবে। এর উপরে আবার যেন তাদের কবলে পড়ে না যায়।

আলিমের বউ-ছেলে ও আলিমের মার নাড়ি টিপে দেখে। না, এদের নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই। সব কষ্ট চুকে-বুকে গিয়েছে। এখন আরাম করে মাটির তলে কায়েমি হয়ে শুয়ে পড়া। অথবা দেখ, অন্য কোন ব্যবস্থা করে সংঘের ছোঁড়ারা।

বাইরে এসে মনে হল, ছায়া সরে গেল যেন একটা। চলন্ত ছায়া। মানুষ অথবা প্রেত? মানুষ হলে পলক না ফেলতে মিলিয়ে যায় কি করে? অপঘাতে মরে গিয়ে মানুষ প্রেতমূর্তি নিয়েছে। সেটা অবশ্য হাসির কথা। সুরেশ সাহসী ছেলে, তবু জনহীন মৃত্যুপুরীর মধ্যে গায়ে তার কাঁটা দিয়ে ওঠে। সেই মেয়ে, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু উঠে পড়ে ছুটোছুটি করবে, এত দূর সে ভাবতে পারে নি। তাকে দেখতে পেয়ে জীবন বাঁচানোর শেষ চেষ্টায় মেয়েটা মরীয়া হয়ে ছুটেছে। মানুষ ছাড়া মানুষের বড় ভয় আর কাকে?

দাওয়ার পাশে ছোট্ট ঘেরা জায়গাটুকু—রান্নাঘর বুঝি। তারের জালের বেঁটে আলমারি—এটা-ওটা ফাটকি-নাটকি রাখে। টর্চ তুলে

ধরেছে সুরেশ, কিন্তু অত করে দেখবার কি ? ওই তো সে আলমারির গা ঘেঁষে। ঢাকা পড়ে নি, গোটা মানুষ আড়াল করবার মতন ও-বস্তু নয়। প্রাণপণে মুখ চেপে রেখেছে আলমারির জালের উপর, গুটিসুটি হয়ে আছে—খরগোশ বিপদের সময় ঝোপে মাথা গুঁজে যে-রকম চুপচাপ থাকে।

উঠে আসুন—

সাড়া দেয় না। বরঞ্চ আলমারির সঙ্গে লেপটে যেন শূন্যাকার হতে চায়। সুরেশ বলে, অমন করে বাঁচতে পারবেন না। বোকামি করেন কেন ?

লায়লা মনে করল, শাসানি। মানুষটা তাকে মারতে এসেছে। চোখ তাকিয়ে চেয়ে সে ফ্যাঁচ স্বরে উঠল : এগিয়েছ তো মেরে ফেলব। খবরদার !

হাত দুটোই তো খালি। মেরে ফেলবে কি হাতের থাবড়ায় ? কথার সঙ্গে মুখের চেহারার সঙ্গতি নেই। কথায় আস্ফালন, মুখে আতঙ্ক। ডাক্তারি কেতাবে পাওয়া যায় এমনি অবস্থার কথা।

লায়লা বলে, কাছে এস না, আমার ছোরা আছে।

সুরেশ শান্ত ভাবে বলে, ছোরাটা ফেলে দিন তবে। ফেলে দিয়ে আপনি আসুন। কনুইটা বিষম ফুলেছে দেখছি। হাড় ভাঙল কিনা কে জানে ? একবার দেখব আপনাকে।

কণ্ঠস্বরে চোখের দৃষ্টিতে কী দেখল লায়লা, আলমারির উপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়াল। আবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে আছে। সুরেশ বলে, বড্ড তাড়া। এক্ষুণি চলে যেতে হবে এখান থেকে। আবার একটা দল আসছে।

লায়লা বলে, আমায় মারবে না তুমি ?

আমার কোন ক্ষতি করেন নি, মারতে যাব কেন ?

আমি যে মোসলমান—

সুরেশের চোখে জল আসবার মতো হল। সামলে নিয়ে বলে,

আমি ডাক্তার। ব্যাগে আমার গুলি-গোলা নয়, ওষুধ আর ব্যাণ্ডেজ। আমার কাজ বাঁচানো। আপনার কনুইটা আগে দেখব। নাড়িটাও দেখতে হবে।

বাইরে এল উঠানের উপর। বন্ধ ঘরের মধ্যে মরামানুষগুলোর সঙ্গে সুস্থসমর্থ সুরেশেরও মনে হচ্ছিল, দম বন্ধ হয়ে যাবে বুঝি! বাইরে চাঁদের আলো। নারকেলগাছ কোন্‌দিকে, তার দীর্ঘ ছায়া পড়ে উঠানটুকু চিরে যেন দু'ভাগ করেছে। ছায়া দেখে বোঝা গেল, চাঁদ উঠেছে আকাশে। নইলে শহরে কে কবে ঘাড় তুলে চাঁদ দেখতে যায়?

লায়লার বাঁ-হাতখানা তুলে ধরে টর্চ ফেলে কনুইয়ের আঘাত দেখছে। মুখের দিকে নজর পড়ে শঙ্কিত হল—সর্বনাশ, পড়ে যাবে বুঝি অচেতন হয়ে! লায়লা প্রাণপণ চেষ্টায় সামলাচ্ছে। শক্র জেনে এতক্ষণ উত্তেজনার মধ্যে ছিল, এইবারে এলিয়ে পড়ছে। ব্যাগের মধ্যে শিশিতে ব্রাণ্ডি আছে, ফ্লাস্কে জল। ফ্লাস্কের গ্লাসে জল ঢেলে তাড়াতাড়ি তাতে কিছু ব্রাণ্ডি দিয়ে বলে, খেয়ে ফেলুন।

লায়লা ইতস্তত করে। সুরেশ বলে, ভাবছেন কি? বিষ দিচ্ছি নে। তাড়াতাড়ি করুন। কেষ্ট মিস্ত্রির দল জোটাতে গেছে, এসে পড়লে বাঁচানো হয়তো শক্ত হবে।

সহসা লায়লা ডুকরে কেঁদে ওঠে, বাঁচতে আমি চাই নে। মামুর একফোঁটা বাচ্ছা অবধি বাঁচতে পেল না, আমি বাঁচব কেন?

কিছু বিরক্ত হয়ে সুরেশ বলল, সে যা হোক করবেন। আমি আপনার গার্জেন নই, চিরকাল পাহারা দিয়ে বেড়াব না। কিন্তু কাপুরুষরা ছোরা কি লাঠি তুলে ধরবে, তার নিচে মাথা পেতে দেবেন—আমি থাকতে তা হতে পারবে না, এইটে জেনে রাখুন।

এক নজর চেয়ে দেখে লায়লা গ্লাস হাতে নিয়ে ঢক করে গালে ঢেলে দিল। প্রশ্ন করে, কোন জাত আপনি সত্যি করে বলুন।

ডাক্তার।

বলে মৃদু হাসল। হেসে বুঝি মেয়েটার মন একটুখানি হালকা করে দিতে চায়। বলে, নতুন পাশ করে এত রোগি কেউ পায় না। দিন-রাত্তির এখন চুটিয়ে ডাক্তারি করে নিচ্ছি।

আবার বলে, হাঁটতে পারবেন তো? হাঁটতেই হবে। গাড়ি নিয়ে কে হাজির আছে আমাদের জন্যে? রানীবাগানটা তাড়াতাড়ি পার হয়ে নিন। তারপরে আস্তে আস্তে যাওয়া যাবে।

খানিক পথ গিয়ে লায়লা একটা গ্যাসের আলো ঠেসান দিয়ে দাঁড়ায়: আর পারছি নে।

পারতেই হবে। জিরিয়ে নিন আধ মিনিট। দেখুন, এ বড় নাছোড়বান্দা ডাক্তার—রোগি হলে তার নিস্তার নেই।

লায়লা রাগের ভঙ্গিতে বলে, হাত ধরতে হয় তা হলে। যাতে ভর দিয়ে যেতে পারি। খালি খালি মুখের বক্তৃতায় ডাক্তার হয় না।

শুধু কেবল নেতা হওয়া যায়।

ভারি তৃপ্তি এতক্ষণে সুরেশের। পাতালবাসিনীর মুখে এইবারে একটু যেন হাসির ঝিলিক। এ-ও তার চিকিৎসার ভিতরে। ক্ষমতা বটে মেয়েটার, মনে মনে সুরেশ তারিফ করছে। এমনি অবস্থার মধ্যে পড়লে পুরুষমানুষ হয়েও সে বোধ করি পাগল হয়ে যেত।

লায়লা বলে, যাচ্ছি কোথা বলুন তো? এরকম যাওয়ার বিপদ আছে। পুলিশ নেই, আইন নেই—

একটু থেমে ঢোক গিলে নিয়ে বলে, মাথার উপরে আল্লাহ্‌তালাও নেই বোধ হয়।

মেসের সামনাসামনি এসে পড়েছে তারা। সুরেশ বলে, আপনার নাম তো জানি নে। আসল নামের গরজ নেই। ঠিক করে নিন, নাম কি হবে। বুঝতেই পারছেন, কি ধরনের নাম। মেসে অবশ্য পুরুষমানুষের ব্যাপার—মেয়েলোকের নাম কেউ জিজ্ঞাসা করতে

যাবে না। তবু ঠিক করে রাখা ভাল! এর কাছে একরকম ওর কাছে অন্যরকম না হয়ে যায়।

এগার

রাস্তার দিকে একটা ঘরে আলো। জোর আলোচনা চলছে জনকয়েকের মধ্যে। কিছু কিছু কানে আসে। এখনকার দিনে ওই যা একটা প্রসঙ্গ—দাঙ্গা। উচ্ছ্বসিত হয়ে একজন বলছে, যাই বলুন, গোড়ায় ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। গরু-ভেড়া-ছাগল জবাই করে করে ও-বেটাদের হাত সেট হয়ে আছে, পারা যাবে না ওদের সঙ্গে। কিন্তু কী বলব, আমাদের ছোড়াগুলোও যা হয়ে উঠেছে! কুচ করে গলা থেকে মুণ্ডুটা নামিয়ে নিল, মুণ্ডু তখন পিটপিট করে তাকাচ্ছে—টের পায় নি ইতিমধ্যে কী হয়ে গেল।

স্নরেশ তাকিয়ে দেখে, লায়লার মুখ কাগজের মতন সাদা হয়ে গিয়েছে। স্নিগ্ধ স্বরে বলে, ভয় কিসের! এ ছাড়া অন্য কি আশা করতে পারেন এখানে? ধরুন, আপনার সঙ্গে আমি গিয়ে পড়েছি আপনাদের কোন পাড়ায়। আপনাকেও ঠিক এই লজ্জার দায়ে পড়তে হত। আজকের এই দিন বলে নয়, ধোঁয়াচ্ছে এ-ব্যাপার অনেক কাল ধরে। দশ-বিশ বচ্ছর। আমার মুসলমান বন্ধুদের বাড়ি গিয়েছি। গেলেই তারা অমুকবাবু বলে একবার ডেকে নেয়। ওয়ার্নিং। সামাল হয়ে কথাবার্তা বল, ভিন্ন জাতের লোক এসেছে। আমি বলতাম, হতভাগা তোরা নুর রেখে দিস না কেন? তবে তো হাঙ্গামায় পড়তে হয় না। থুতনিতে নুর থাকা আর নুর না থাকা—দু-জাতের দু-রকম নিশানা হয়ে যায়।

হাসি-গল্পে লায়লার মন হালকা করছে। দরজায় ধাক্কা দিল, কড়া নাড়ছে জোরে। নিচের ঘরের তার্কিকরা চুপ করে যায়। উপরতলা থেকে একজন মুখ বাড়িয়ে বলে, কে?

কালীপদবাবুকে ডেকে দিন। বলুন স্নুরেশ—বাগবাজারের স্নুরেশ রায়। বালিকা-শিক্ষালয়ে যখন কাজ করতেন, আমার ভাইঝিদের পড়াতেন উনি।

মাস্টার মশায়, কে একজন আপনাকে ডাকছেন। নিচে, রাস্তার উপর। সঙ্গে মেয়েলোক।

বলে সেই মানুষটা হাঁক দিয়ে উঠল, কি করছ ঠাকুর? মেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, দিনকাল এই রকম, দরজা খুলে ভিতরে আসতে দাও।

কালীপদ মাস্টার চোখ মুছতে মুছতে নেমে এলেন: কী ব্যাপার, এত রাত্রে কোথা থেকে?

রাতটুকু এখানে থেকে যাব মাস্টার মশায়। উপায় নেই। এখন পথে বেরনো যায় না। এমনই দেখুন, কী কাণ্ড করেছে! বড় অল্পের জন্য বেঁচে এসেছেন।

মাথার ঘন চুলে চাপ-চাপ রক্ত, রক্তাক্ত কাপড়চোপড়। ফুলো হাতখানা লায়লা ডান হাতে ধরে রেখেছে। অবস্থা দেখে কালীপদ মাস্টার হায়-হায় করে উঠলেন। মেসের মানুষ বারাণ্ডায় বেরিয়ে আসছে, ঘুম থেকে উঠে এসেছে কেউ কেউ। ছোটখাট ভিড় হয়ে দাঁড়াল। স্নুরেশের মাথায় বুদ্ধি খুলে যায় হঠাৎ। বলে, আমার বউদির বোন। আপনি সেই নীরা-ইরাকে পড়াতেন, তাদের ছোট মাসি। পার্ক স্ট্রীটের উইমেনস হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করতেন। হস্টেলের উপর হামলা। এঁকে মড়া ভেবেছিল। পুলিশ নিয়ে আমরা গিয়ে পড়লাম। মড়ার গাদার মধ্যে যেভাবে ছিলেন, আমরাও প্রথমটা মড়া ভেবে ফেলে আসছিলাম।

কালীপদ মাস্টার বিষম উত্তেজিত হয়েছেন: পশু, পশু! ফুলের মতন কচি মেয়ে—আ-হা-হা! যেন শিলে রেখে আদা-মরিচের মতন থেঁতো করেছে। যাই বলুন, এমন নৃশংস কাজে আমাদের জাতের কখনো হাত উঠত না। ওরা বলেই পেরেছে।

নিচের ঘরের সেই মানুষ ক'টি কপাটের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে।

তাদের দিকে চেয়ে সুরেশ বলে, শুনলেন আপনারা মাস্টার মশায়ের কথা? একটু আগে আপনারা কিন্তু ছোঁড়াগুলোর হাতের তারিফ করছিলেন। আর মাস্টার মশায় তো বলছেন, বাতে-ধরা হাত—হাত নাকি ওঠেই না এসব কাজে। কোন কথা ঠিক, বলুন এবারে।

কালীপদ মাস্টার ছুটোছুটি করছেন। ম্যানেজারের সঙ্গে শলাপরামর্শ হল। সুরেশকে বলেন, মেস জায়গা বুঝতে পারছ। পুরো ঘর নিয়ে কেউ আমরা থাকি নে। তোমায় নিয়ে কথা নয়, একটা মাদুর পেতে তুমি যেখানে হোক পড়তে পার। কিন্তু মেয়ে-লোকের বেলা তা হয় না। আলাদা জায়গা চাই তো বটে। আর যে রকম অবস্থা, নরম বিছানা না হলে মেয়ে মোটে শুতেই পারবে না।

বলতে বলতে কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠলেন: মা-জননী, কার মুখ দেখে আজ তোমার সকাল হয়েছিল গো!

ম্যানেজার বলেন, গাঙ্গুলি মশায় দেশে গেছেন, তাঁর তক্তাপোশ-বিছানা খালি। বিভূতিবাবুর এতক্ষণে তো একঘুম কাবার। আপনি তাঁকে বলুন মাস্টার মশায়। ঘুম যেটুকু বাকি আছে, অন্য ঘরে গিয়ে সেরে নিনগে। এক ইস্কুলে কাজ করেন, আপনার কথা তিনি ফেলতে পারবেন না।

মোটামুটি এইরকম ঠিক করে ম্যানেজার বিভূতিকে ডেকে তুললেন: মাস্টার মশায় বলছেন, তাঁর ঘরের মেঝেয় তোশক-চাদর পেতে নিন আপনি।

বিভূতি ভ্রূকুটি করে বলে, কেন শুনি? পুরো মাসের সিট-ভাড়া চুকিয়ে দিয়েছি। মেঝেয় শুতে যাব কোন দুঃখে?

কালীপদ তাড়াতাড়ি বলেন, না বিভূতি, তুমি তক্তাপোশে শোও, আমার বিছানাটা নামিয়ে রেখ, মেঝেয় শোব আমি। এই সুরেশদের সঙ্গে বিশেষ জানাশোনা আমার। বিপাকে পড়ে এসেছে। মেয়েটি ওদের আত্মীয়া। পার্ক স্ট্রীটে আটক পড়ে গিয়ে, চেয়ে দেখ, কী অবস্থা হয়েছে।

বিভূতি লায়লার দিকে তাকাল। আপাদমস্তক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

কোথায় থাকতেন ইনি ?

পার্ক স্ট্রীটের উইমেনস হস্টেলে।

ওঃ! আর সঙ্গের ভদ্রলোকটি জানাশোনা আপনার, মেয়েটাকে ওঁর আত্মীয় বলছেন ?

জেরার ভঙ্গিতে সুরেশ ঘাবড়ে যায়। চিনে ফেলল নাকি ?

কালীপদ বলেন, একটা রাত্রির জন্য কষ্ট কর বিভূতি! দেখ, এ-অবস্থা তোমার আমার সকলের হতে পারে।

বিভূতি বলে, আপনি বলছেন, করি তবে কষ্ট। ভাল চেনা আপনার সঙ্গে তো বটে ?

গজর-গজর করতে করতে বিছানা তুলে নিয়ে বিভূতি কালীপদর ঘরে যায়। কালীপদ বলেন, মানুষটা ঐরকম রগ-চটা। কাঁচা ঘুমে ডেকে তুলেছে বলে রাগ হয়েছে।

এ-দিকটা এক রকম হল, কিন্তু খাওয়ার কি ? রান্নাঘরের পাট চুকেছে, বাসন-মাজা ঘর-ধোওয়া অবধি সারা। কাঁচা চাল চাট্টি মিলতে পারে, কিন্তু উনুনে নতুন কয়লা সাজিয়ে ফুটিয়ে দিচ্ছে কে ? আর এই সমস্ত করতে করতেই তো সকাল হয়ে যাবে।

কালীপদ দুঃখ করে বলেন, একদিন আসতে বলেছিলাম। তা এমন অবস্থার মধ্যে এলে, দোকান থেকে দুটো মিষ্টি এনে জল খেতে দেব সে উপায় নেই। তোমাদের বাড়ি পড়াতে যেতাম, একগাদা করে খাবার আসত।

সুরেশ বলে, বড্ড কষ্ট দিচ্ছি মাস্টার মশায়। কিন্তু সত্যিই কিছু না হলে চলবে না। আমি খাব না, ওঁর জন্যে। মুখ দেখেই তা বুঝতে পারছেন। যে ঝড় চলেছে, তার মধ্যে খাওয়াদাওয়ার কোন উপায় ছিল ?

দেখ এখন কার ঘরে কি আছে। সতীশবাবু দিলেন

বিস্কুট দু'খানা। তারিণীবাবুর কোটোয় বাসি মুড়ি। ভূদেববাবু দেশ থেকে পাটালি এনেছিলেন, তার ক'খানা বের করে দিলেন।

সুরেশ বলে, বাঃ বাঃ, রাজসূয় আয়োজন। এর উপরে রয়েছে কুঁজো ভরতি জল। খাওয়া-শোওয়া দুই-ই তোফা। বুদ্ধি করে আপনাদের এখানে এসে পড়েছি, তাই।

ঘরের মধ্যে লায়লা খাচ্ছে। বারান্দায় বেঞ্চির উপর মাস্টার মশায় গল্প জমিয়ে নিলেন।

ইরা-নীরা কত বড় হল এদ্দিনে! নরেশবাবু সেই লাহোরের চাকরি নিয়ে গেলেন, এর মধ্যে আসেন নি আর কলকাতায়?

সুরেশ বলে, এবারে চলে আসছেন। চিঠি এসেছে। রওনা হয়ে পড়েছেন, থাকার উপায় নেই আর ওদিকে।

কোথায় যে থাকা যায় দুনিয়ার মধ্যে! এখানেও থাকার এই নমুনা দেখতে পাচ্ছ না?

জোরে এক নিশ্বাস ফেললেন কালীপদ। বলেন, ওঁরা এলে আমায় একটু খবর দিও। দেখে আসব। বড্ড বুদ্ধিমতী মেয়ে নীরা—দেখতে ইচ্ছে করে।

সুরেশ সগর্বে বলে, বরাবর ইংরেজিতে ফার্স্ট হয়ে আসছে। যেসব ইস্কুলে পড়েছে—ধরুন, কসমোপোলিটন জায়গা, সর্বজাতের মেয়ে পড়ে। খাস বিলেতেরও আছে। নীরার সঙ্গে কেউ পারে না। আপনি গোড়াপত্তন করেছিলেন মাস্টার মশায়, সেই জোরে চলছে।

কালীপদ মাস্টার ঘাড় নাড়েন: উঁহু, কত ছেলেমেয়ে পড়াই আমি। পড়ানোই কাজ। ওরকম ধীশক্তি আমি আর দেখি নি। তোমার অন্য ভাইঝি ইরার কথা তো বলছি নে। সে-ও ভাল মেয়ে, কিন্তু ঠাণ্ডা স্বভাবের। নীরার মতো অমন তীক্ষ্ণ নয়।

তারপরে গভীর কণ্ঠে বললেন, বেঁচেবর্তে থাক, শতেক পরমায়ু হোক। দেখ, পড়াশুনোয় কখনও যেন অবহেলা না হয় ওদের।

সরোজিনী নাইডু ইংরেজিতে পদ্য লিখতেন—আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, তাঁকেও ছাড়িয়ে যাবে ও-মেয়ে।

সুরেশের মন ভরে যায়। লাহোরের এত সব ভয়াবহ খবর—বড় অস্বস্তিতে দিন যাচ্ছে। কিন্তু সৌম্যমূর্তি পলিতকেশ শিক্ষক মশায় প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। ঋষিতুল্য এ মানুষের কথা মিথ্যা হবে না। ভাল আছে ইরা-মীরা, ভাল আছেন ওঁরা সকলে। কোন বিপদ-আপদ ছুঁতে পারে নি, এসে পড়বেন শিগগির একদিন।

লায়লার উদ্দেশে কালীপদ বললেন, মুড়ি ক'টা চিবানো হয়ে থাকে তো শুয়ে পড় এবারে মা। বিছানাপত্তোর ঠিক আছে তো? আসছি একবার আমরা ভিতরে। নিজের চোখে দেখে দিই।

বলছেন, নির্ভাবনায় ঘুমোও মা। সমস্ত শহর রসাতলে যাবে, আমাদের এ-পাড়ার কিছু হবে না।

ঘরের কোণে দাঁড়-করানো বেঁটে সাইজের লোহার রড—সেটা নিয়ে এসে কালীপদ শিয়রের কাছে রাখলেন।

সুরেশ আশ্চর্য হয়ে বলে, এটা কি হবে মাস্টার মশায়?

কিছু না, কিছু না। আমাদের পাড়ায় কোন ভয় নেই। তাহলেও সাবধানের মার নেই। কত জনে বালিশের তলে ছোরা রেখে ঘুমোয়। সড়কি-বল্লম চকচকে করে কেউ পাশে রাখে। নিরস্ত্র কেউ আজকাল থাকে না, নিদেন পক্ষে ছুরি-চাকু যা হোক একখানা গাঁটে গুঁজে রাখবে। আমাদের ছাতে গিয়ে দেখ, অমন দু-গাড়ি ইট গাদা করে রেখেছে—দরকার মতো আলসের আড়ালে দাঁড়িয়ে ইটবৃষ্টি হবে। কিন্তু কিছুই হবে না মা, একটা পটকা ফোটাতেও সাহস করবে না কোন বেটা এদিকে এসে।

এই প্রবোধ দিতে যাওয়াই কাল হল। এক ঘরে একলা থাকবে না মেয়ে। কিছুতেই না। ভয়ে পাংশু মুখ। টপটপ করে জল গড়াচ্ছে দু-গাল বেয়ে। করা যাবে কি এখন? মেসের ঝি ভাত

বেড়ে নিয়ে অনেকক্ষণ আগে চলে গিয়েছে। সে থাকলে না হয় বলে-কয়ে দেখা যেত, একটা রাত্রি এখানে কাটাতে পারে কি না! এখন তো নিরুপায় একেবারে। কিন্তু কানে নিচ্ছে কে এ-সব? বলতে গেলে ডবল হয়ে যায় কান্না।

সুরেশ বলে, কী মুশকিল দেখুন দিকি!

কালীপদ নিম্নস্বরে বলেন, তুমি ডাক্তার, তোমায় আমি কি বোঝাব? মাথা ঠিক সুস্থ নয়, নইলে এমনধারা করে? যে কাণ্ড গিয়েছে ছেলেমানুষের উপর দিয়ে! আমারই অন্যায় অমন করে বিনিয়ে বিনিয়ে বলা। বুঝতে পারি নি।

অতিশয় মোলায়েম কণ্ঠে বোঝাতে লাগলেন, শুয়ে পড় মা, ঘুমোও। ঘুমোনো তোমার পক্ষে বড্ড দরকার, শরীর খানিকটা তাজা হবে। আমরা এই বেঞ্চিটার উপর বসে রইলাম—আমি আর সুরেশ। সারারাত জেগে থাকব। শোন, আমার এক মেয়ে আছে দেশের বাড়িতে। এই তোমার বয়সি হবে। সেই মেয়ের নাম নিয়ে বলছি, কেউ এদিকে ঘাড় তুলে তাকাতে পারবে না। বুড়োমানুষের কথা অবিশ্বাস কোরো না, নির্ভয়ে ঘুমোও।

এমনি অনেক রকম বলার পর লায়লা দরজা দিল। হুড়কো বন্ধ করল, ছিটকিনি এঁটে দিল। অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ নেই। শুয়ে পড়েছে—ঘুমিয়েও পড়েছে মনে হয়। যা কষ্ট গিয়েছে, শুলেই আপনি চোখ বুজে আসবে। আহা, কষ্ট-ভাবনা ভুলেছে এতক্ষণে ঘুমের মধ্যে। ঘুমোক।

সুরেশ বলে, আপনি এবারে ঘরে যান মাস্টার মশায়। দুজনের কি দরকার? দরকার একজনেরও নেই, সে আপনি জানেন আমিও জানি। কিন্তু আমার কোন কষ্ট নেই—ঘরের ভিতর না শুয়ে বেঞ্চির উপরেই না হয় শুলাম। রিলিফের কাজ —রাস্তায় টহল দিতে দিতেই কত রাত্রি কেটে যায়। বড্ড

ঘুম ধরল তো ফুটপাথের উপরে কোন দেয়াল ঠেশ দিয়ে বসে পড়লাম। আমার অভ্যাস আছে। কিন্তু আপনাকে বিস্তর কষ্ট দিলাম। হাতজোড় করে বলছি, এবারে শুয়ে পড়ুনগে। নয়তো আমার অপরাধের অন্ত থাকবে না।

বলাবলিতে কালীপদ উঠে ঘরে শুতে গেলেন। বয়স হয়েছে, এই জোয়ান যুবাদের সঙ্গে কস্ট সয়ে পেরে উঠবেন কেন ?

বেঞ্চির উপরে বাঁ-হাত বালিশের মতো মাথার নিচে দিয়ে সুরেশ চোখ বুঁজে ছিল। ধড়মড় করে এক সময় উঠে বসল। দোর খুলে লায়লা কখন বেরিয়ে পড়েছে। তার পাশে এসে দাঁড়াল। শেষ রাত্রি, খণ্ড-চাঁদ পশ্চিম দিগন্তে ঢলেছে। চাঁদের আলোয় জ্বলছে লায়লার চোখ দুটো। অস্বাভাবিক ভয়াবহ রকমের দীপ্তি।

সুরেশ সহজ ভাবে বলে, ঘুম হচ্ছে না ?

আপনি ঘুমোচ্ছেন, আর মাস্টার মশায় তো লম্বা-লম্বা কথা বলে সরে পড়লেন। এর উপরে আমি ঘুমোলে মেরে দিত এতক্ষণে।

কে মারবে ?

ওই তো, মারবারই মানুষ সব চারিদিকে। সবাই আপনাদের জাতের। বালিশের তলে ছোরা, ঘরের কোণে সড়কি, ছাতের উপরে ইট—

যেমন কাণ্ড মাস্টার মশায়ের ! কী সব বলে গেলেন, তাই এখনও মাথায় ঘুরছে। কেউ মারতে আসবে না, চেনেই না আপনাকে কেউ।

চোখ বড় বড় করে ভীত কণ্ঠে লায়লা বলে, চেনে হয়তো ওই বিভূতিবাবু। কেমন করে তাকাচ্ছিল ! আমায় মেরে ফেলবে।

সুরেশ তাচ্ছিল্যের ভাবে উড়িয়ে দেয় : উঁহু, কেমন করে চিনবে ?

কোন জায়গায় দেখেছে হয়তো। গানের গলা ছিল, সকলে গাইতে বলত। তখন তো জানি নে। কত জায়গায় গান

গেয়েছি। কলেজে বর্ষামঙ্গল হল—মরণ আমার! আমোদে মেতে গেলাম। হল-ভরা মানুষ গিজগিজ করছে, পর পর তিনটে গান গাইতে হল সেখানে। গানের পর হাততালি, বারবার গাইতে বলে। কী করব! তারই এবার ফল ফলছে। বিভূতিবাবু লোকটা তাকায় কেমন করে! আর মুখের ঐ রকম বাঁকা-বাঁকা কথা! কিন্তু এবারে আর ইঁদুর হয়ে লাঠি খাব না। আমি আগে মারব।

কাপড়ের নিচে থেকে লোহার রডখানা বের করল লায়লা। বলে, একটুও শুই নি আমি। সারাক্ষণ মুঠোয় নিয়ে তৈরি হয়ে ছিলাম। বসে বসে পারি নে। দুয়োর খুলে এগিয়ে দেখলাম, এলো কদ্দূর। সমস্ত বারাণ্ডা চক্কোর দিয়েছি, সিঁড়ি ধরে নেমেও ছিলাম অনেকটা দূর।

সুরেশ সভয়ে ভাবছে, সকাল কতক্ষণ পরে আর! একে নিয়ে ভালয় ভালয় বেরুতে পারলে যে হয়! চলে যাক আপন কোটে—প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়ে সুরেশের দায়িত্ব খালাস। শুধু কনুই আর মুখ নয়—তার চেয়ে অনেক কঠিন—মাথার চিকিৎসার আগে দরকার। এমন মেয়ে সঙ্গে রাখা বিপদ। রাক্কুসে মেয়ে—কখন কাকে মেরে দেয়, কী কাণ্ড ঘটিয়ে বসে!

লায়লা বলে, আপনি অঘোরে ঘুমোচ্ছেন—দেখে যেন খুন চেপে উঠল! মেরে দিই মাথায় এক বাড়ি। নীলুফারকে মেরেছিল—কী রক্ত পড়ল গলগলিয়ে! ভাবলাম, আপনাকেও মেরে দিই। রক্তের বদলে রক্ত। মেরে তারপর নিজে মরতাম—বিষ আছে আমার কাছে।

হাসিমুখে সুরেশ বলে, দিলেন না কেন মেরে? ঘুমিয়ে ছিলাম—মাথা ছাতু-ছাতু হয়ে যেত, কোন-কিছু জানতে পারতাম না।

হাসি দেখে লায়লার উত্তেজনা বেড়ে যায়ঃ বলছি আপনাকে, আমার সামনে অত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবেন না। বাড়িতে একটা

মুরগি জবাই হলে আমি ছুটে পালাতাম, কাঁদতাম। আগের সে মানুষ আর নই। মানুষ মারা কিছুই নয়—মরাও কত সহজ! আমাদের অতটুকু নীলু পর্যন্ত মরতে পারে, আমি পারব না?

বলতে বলতে ভেঙে পড়ে। আগুন নিভে গেল চোখের জলের ধারায়। বলে, সঙ্গে বিষ নিয়ে ঘুরছি কতদিন থেকে। বিপদ ভেবে বিষ যোগাড় করে রেখেছিলাম। অথচ কী আশ্চর্য, লাঠির পিটুনি খাচ্ছি, বিষের কথা তখন মনে পড়ল না। জ্ঞান হলে দেখি, বাড়ির সবাই মড়া—আমি একলা শুধু বেঁচে আছি। বাঁচতে কে চায়? বেঁচে রয়েছি অন্ততপক্ষে একটা লোক বদলি নিয়ে যাব বলে। মামার বাড়ির চারজন গেল চোখের উপরে, একজনের উপরে অন্তত শোধ নেব। আপনাকে খুন করতে যাচ্ছিলাম। দিব্যি করে বলছি। কী করে যে সামলেছি! দেখুন, আর কষ্ট দেবেন না লোভ আমার সামনে এমনি করে মেলে রেখে।

সুরেশ নির্বিকার কণ্ঠে ডাক্তারি ব্যবস্থা দেবার ভঙ্গিতে বলে, শোন গিয়ে এবারে। ঘণ্টাখানেক রাত আছে। ঘুমোতে পারলে কষ্ট কমবে। ভাল হয়ে যাবেন।

লায়লা আকুল হয়ে বলে, আবার ভাল হব আমি? বলে দিন। সত্যি করে বলুন। আমোদ-আহ্লাদ করে বেড়াব, কলেজের বর্ষামঙ্গলে গান গাইব, নানীর সঙ্গে খুনসুটি করব বাড়ি গিয়ে? মানুষ আবার ভাল হবে? কিন্তু দুনিয়া উল্টে গেছে, কেমন করে হবে?

কঠিন আদেশের মতো সুরেশ শুধু বলে, ঘরে যান—

বার

দিনমান—নতুন দিন। ঘোর থাকতেই মেসের ক'জন বেরিয়ে পড়েছে। ট্রামরাস্তা অবধি ঘুরে দেখে নতুন দিনের হালচাল বুঝে আসবে—আগের রাত্রে কী পরিমাণ তাণ্ডব হল।

না, খবর বেশ ভাল। বাস বেরিয়েছে আজ রাস্তায়।

কিন্তু ভাল খবর কারও কারও কাছে ভাল লাগে নাঃ বলকি হে, জ্বলতে না জ্বলতেই ঠাণ্ডা? পাঞ্জাব-দিল্লির গোস্ত-রোটি খাওয়া লোক, তাদের কথা না-ই ধরলাম। কিন্তু ঢাকা তো আমাদেরই মতন ভেতো—কত আগে থেকে লেগেছে, এখন অবধি সেখানকার গরম কাটল না।

ঠাণ্ডা কে বলছে? বাস বের করেছে পেটের গরজে—রুজি বন্ধ করে খালি পেটে কদ্দিন লড়াই চালাবে? গরজ পাবিলিকেরও বটে। দক্ষিণে উত্তরে যোগাযোগ হচ্ছে না। বাসের লোক বলছে, যতক্ষণ পারা যায় চালাই, বেগতিক দেখলে গ্যারেজে তুলে ফেলতে কতক্ষণ!

লায়লা নিচে নেমে দাঁড়িয়েছে। সুরেশ বিদায় নিচ্ছে: যাই তবে মাস্টার মশায়।

খবরবাদ নিয়ে খুব সামাল হয়ে যাবে কিন্তু। বাগবাজার যাচ্ছ তো এখন?

তা ছাড়া আর কোথায়? বাস চলছে শুনতে পেলাম। নিয়ে গিয়ে মার হেপাজতে দিই। তিনি নিয়ে বিছানায় শুইয়ে রেখে যা করতে হয় করবেন। সেবাশুশ্রূষা আমার মার মতো কেউ পারে না। আমি তো নতুন ডাক্তার, কিন্তু দাদা অত পুরানো হয়েও মার কাছে ধমক খান। ঘাড় হেঁট করে মার সব ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়।

রাস্তায় নেমেই লায়লা মাথায় কাপড় তুলে দেয়। এক লজ্জাবতী বউ। খরকণ্ঠে বলে, বাড়ি নিয়ে তোলবার মতলব করছেন? কক্ষণো না, কক্ষণো না। আপনাদের বাগবাজারের কথা জানি। বাঘের মুখ থেকে নিয়ে সাপের ছোবলের নিচে ফেলবেন। কক্ষণো আমি যাব না।

সুরেশ বলে, রক্ষে করুন, আপনাকে নিয়ে যাব বাড়িতে? রাত্রে উঠে যে কাণ্ড করলেন—মেস জায়গা, তাই রক্ষে। আপনি শুয়ে পড়লেন, লোকগুলোও যে যার ঘরে গিয়ে খিল দিল। গৃহস্থবাড়ি হলে চাপা থাকত না। আর আমাদের বাড়ি তো খুট্ করে একটা শব্দ হলে মা অমনি 'কি হয়েছে' 'কি হয়েছে' করে এসে পড়েন। কুটুম্ব পরিচয় দিয়েছি যে—কুটুম্ব মেয়েকে এই অবস্থায় বাড়ি নেওয়া ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। তাই বলতে হল। কোথায় যাবেন বলে দিন এবারে।

পার্ক সার্কাসে—ঝাউতলায় যাব। মোবারক মোল্লার কাছে।

তাই চলে যান। আত্মীয়লোক?

লায়লা বলে, মুসলমান। মুসলমান ছাড়া আত্মীয় কোথায় আমাদের? আর সব ভুয়ো, মুখের কথা। অসময়ে কর্পূরের মতো উবে যায়। আমার মামাকে দিয়েই তা দেখলাম।

সুরেশ বলে, বাস যখন ধর্মতলা দিয়ে যাবে, আপনি টুক করে নেমে পড়বেন। ওটা আপনাদের এলাকা। আমরা গেলে কোতল করবে, আপনি দিব্যি চলে যাবেন। কেউ কিছু বলবে না।

নির্জন রাস্তা, কদাচিৎ দুটি-একটি মানুষ—তাতেই লায়লা জড়সড় হয়ে দাঁড়ায়। সুরেশ একসময় বলল, মাথার কাপড় ফেলে দিন বরং। ওতে আরও বেশি করে নজর পড়ে। ঘোমটার রেওয়াজ উঠে গেছে।

লায়লা বলে, রেওয়াজটা ভাল ছিল তাই আজকে ভাবছি। ঘোমটা কেন, বোরখাও ছিল তো আমাদের। আমার মা-দাদী সব

পর্দানসিন ছিলেন। কেন সমস্ত তুলে দিলাম? কেন মুখ দেখাই, কেন আমরা আগ বাড়িয়ে পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে যাই?

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ায়: এ-পথে যাব না—

ট্রাম-রাস্তার সোজা পথ এইটেই তো—

লায়লা বলে, সোজা পথ আর আমাদের নয়। গলিঘুঁজি খুঁজুন। আমার মামার বড় জাঁকের পাড়া, আমি কলেজে যেতাম—রানীবাগান থেকে বেরিয়ে সোজা গিয়ে ট্রামে উঠতাম। কত লোকে দেখত। আজকে দেখতে পেলে তারা ছেড়ে দেবে না।

তাই হল। চোরের মতো সাপের মতো সহজ মানুষের ভাল পথ এড়িয়ে এক গুণের জায়গায় তিন গুণ পথ ঘুরে পৌঁছল বড়-রাস্তায়। ঘোমটা ফেলে হাত ধরে যাচ্ছে এখন সুরেশের। ভেবে দেখেছে এইটে বেশি নিরাপদ। হাত ধরে ঘনিষ্ঠ হয়ে যে পথ চলে, সে কি আর ভিন্ন জাতের কেউ? হিন্দুঘাঁটির মধ্যে সুরেশের যদি ভয় না থাকে, তারও নেই। বাসে উঠে সুরেশের পাশটিতে বসে পড়ে। তখন তো একেবারে নিঃশঙ্ক।

ফাঁকা গাড়ি, প্যাসেঞ্জার অতি অল্প। টিকিট করতে গিয়ে সুরেশ কণ্ডাক্টরকে বলে, আমার শ্যামবাজার। ধর্মতলায় ইনি নেমে যাবেন।

কণ্ডাক্টর শিউরে ওঠে: আরে সর্বনাশ! তা-বড় তা-বড় জোয়ান-পুরুষে পারে না, উনি নামবেন কোন্ সাহসে? বোমা ফাটছে মিনিটে মিনিটে, বন্দুক ছুঁড়ছে।

সুরেশ লায়লার দিকে তাকাল। লায়লা বলে, টিকিট যেখানকার হয় হোক। যাই তো আগে ধর্মতলায়।

কণ্ডাক্টর চলে গেলে ফিসফিসিয়ে বলল, জাতের পরিচয় ভাগ্যিস গায়ে লেখা নেই। তা হলে কি নিয়ে যেত বাসে চড়িয়ে, দিত আমায় টিকিট? আবার ভাবছি—পরিচয় যদি লেখা থাকত, বাস থেকে ধর্মতলায় নেমে পড়লেই নিশ্চিন্ত। বোমা-বন্দুক আমায় বাদ দিয়ে ছুঁড়ত।

বাস এসপ্লানেড ছেড়ে ধর্মতলা-মুখো আসতে বোঝা গেল, নামবার কথাই উঠতে পারে না। নক্ষত্রবেগে দৌড় দিয়েছে, প্রাণপণে যেন ছুটে পালাচ্ছে করাল সর্বনাশের মুখ থেকে। দোকানপাট বন্ধ, গাড়িঘোড়া চলছে না। ফুটপাথের এখানে-ওখানে একটি-দুটি মানুষ লুঙি বা পাজামা পরা। মনে হয় কটমট করে তাকাচ্ছে এই দিকে। অথবা মনই হয়ে গিয়েছে এই রকম—উদ্দেশ্যহীন সহজ দৃষ্টিতে ওরা তাকাচ্ছে, একথা যেন ভাবতে পারা যায় না। ছুট দিয়ে একেবারে বউবাজারের মোড় অবধি এসে বাস থেমে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

কণ্ডাক্টর বলে ওঠে, বাব্বা!

এক রসিক প্যাসেঞ্জার বলল, গাড়ির যদি টায়ার ফাটত ওই ধর্মতলার উপর, কিংবা যদি কলকব্জা বিগড়াত?

অন্য সবাই খিঁচিয়ে ওঠে: কু-ডাক ডাকবেন না মশায়। এতগুলো জীবন চ্যাংড়ামির বস্তু নয়। নিতান্ত দায়ে পড়ে প্রাণ হাতে করে বেরুনো—তার মধ্যে বলে নাকি এই সব!

সুরেশ বলে, এইখানে এবারে নামতে পারেন।

চোখ বড় বড় করে লায়লা তাকায় তার দিকে: পারি বইকি! ভারবোঝা কত আর বইবেন? কিন্তু এখান থেকে কার কাছে কি উপায়ে যাব, যদি একটু বলে দিতেন! বিষের ক্যাপসুল যখন রয়েছে, শেষ উপায় অবশ্য আছেই।

মুহূর্ত পরে আবার বলে, চুপ করে আছেন, কিছু তো বললেন না! আচ্ছা, নেমেই যাই তবে।

অভিমানের সুর রীতিমত। বাস ছেড়ে দিল, নামবার কোন লক্ষণ নেই। এ-জায়গায় নেমে যাবেই বা কোথা—সুরেশ ভেবে দেখছে। মুখ ফিরিয়ে আছে লায়লা। রাগ করেছে, কথা বলবে না। বাড়ি নিয়েই তুলতে হল তবে। উপায় কি!

পথের মাঝে আরও গোটা দুই বিপজ্জনক জায়গা—লায়লার নিজের জাতের মহল্লা। কিন্তু একটা মানুষ টুপ করে ছুঁড়ে দেওয়া

যায় না তো বাসের জানলা দিয়ে? জায়গাগুলো নির্বিঘ্নে পার হয়ে শ্যামবাজার এসে পড়েছে। পথে লোকজন এবারে। এমন কি সিনেমা-হাউসেরও কোলাপসিবল গেট খোলা, লবীতে ঢুকে লোকে ঘুরে ঘুরে স্টিলের ছবি দেখছে। এক প্যাসেঞ্জার উল্লাসে বলে উঠল, আর ভয় নেই—

অনেকে নেমে গেল। উঠলও কয়েকটি। লায়লার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সুরেশ সান্ত্বনা দেয়, ভয় কেটে গেছে, শুনলেন তো? পরের স্টপে আমরা নামব।

সেই লোকটা আবার বলে, উঃ, জোরে এতক্ষণ একটা নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না! চেঁচাই, লাফাই নাচ-গান-হল্লা যা-ইচ্ছে করি এবারে।

সুরেশ বলে, শুনছেন? নাচতে গাইতে পারা যায় এখন। আপনাদের বর্ষামঙ্গলের পালাও করা যায়। আসুন, নেমে পড়ি—

পা যেন চলতে চায় না লায়লার। সুরেশ বলে, মুষড়ে গেলেন কেন? বলছিল ওরা, শুনতে পেলেন না? কোন ভয় নেই।

সে কি আমার?

হ্যাঁ, আপনারও। থাকছেন খুব বেশি তো আজকের দিনটা। আপনাকে বাড়ি রেখেই আমি থানায় চলে যাব। থানা থেকে গাড়ি করে ঝাউতলা পৌঁছে দেবে।

লায়লা দাঁড়িয়ে পড়ল: সোজা আমায় থানায় নিয়ে যান। আপনাদের বাড়ি যাব না, কক্ষণো না। আপনি থাকলেও না হয় হত। আপনি থাকবেন না—অন্য লোকের কাছে থাকতে পারব না আমি।

কালকের ঐ কাণ্ডের পরে দোষও দেওয়া যায় না। কাল রাত্রি থেকে সুরেশের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, খানিকটা পরিচয় হয়েছে—তার কথা আলাদা। একলা একটি প্রাণী কেমন করে কোন ভরসায় থাকবে হিন্দুর বাড়ি? কিন্তু উপায়ও নেই কিছু। হুট করে থানায় নিয়ে যাওয়া চলে

না। হালচাল বুঝে দেখতে হবে আগে। সরকারি চাকর বলেই থানার মানুষ জাত-বেজাতের অতীত নয়—হিন্দু আছে, মুসলমান আছে। আজেবাজে লোকও অনেক থাকে থানায়। বিশেষ এই ডামাডোলের দিনে। লায়লার পরিচয় চাউর হয়ে গেলে বিপদ শুধুমাত্র লায়লারই নয়। পাড়ার ছেলেরা সুরেশকে বলবে ঘরভেদী বিভীষণ। পিটিয়ে পিঠের চামড়া তুলে নেবে এই দাঙ্গার দিনে বাড়াবাড়ি রকমের মহানুভবতা দেখানোর জন্য।

অবস্থাটা মোটামুটি বুঝিয়ে বলল লায়লাকে। বলে, অবুঝ হবেন না। দোহাই। বাড়িতে আমার একলা মা। আর এক বুড়োমানুষ চাকর—মধু। মা তো প্রায় ঠাকুরঘরেই পড়ে থাকেন—

একটুখানি থেমে বলে, আরও সুবিধা, বিষম শুচিবেয়ে আমার মা। ডাক্তার হয়ে পূঁজরক্ত ঘাঁটি, মুরগি-টুরগি খাই, জাতবিচার করি নে—পেটের ছেলে হয়ে এই অনাচারে আমরাই মায়ের কাছাকাছি হতে পারি নে। তাই বলছি, দু-চার ঘণ্টার ব্যাপার—চুপচাপ থাকবেন। তারপরেই তো নিজের কোটে পৌঁছে যাচ্ছেন। জীবনে কোনদিন আর দেখাশুনো হবে না।

তের

বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়ে। উপর থেকে ভারী গলার হাঁক আসে, কে ?

আমি সুরেশ। আমাদের মধুকে ডাকছি।

লায়লা বলে, আপনি বললেন মা আর চাকর ছাড়া কেউ নেই। অন্য গলা শুনলাম তবে কার ?

উপরতলায় ভাড়াটে থাকে। উনি ওই উপরের ফ্ল্যাটের। আলাদা সিঁড়ি, নিচের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। নিচেটা সম্পূর্ণ আমাদের। তাই তো থাকবার মানুষ হয় না। তবে আমার দাদা-বউদিরা সব চলে আসছেন। তাঁরা এলে জমজমাট হবে।

মধুসূদন কাপড় মেলে দিচ্ছিল। তাকে ডেকে দিয়েছে। ছাত থেকে উঁকি দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে মধু বলে, আসছি দাদাবাবু—দাঁড়াও।

গণ্ডগোলের সময় দিনরাত এখন দুয়োর দিয়ে রাখে। লায়লার দিকে ফিরে সুরেশ বলল, আপনার নাম কিন্তু লীলা।

লীলা নয়, লায়লা। কিন্তু নাম আপনি কি করে জানলেন ?

সুরেশ বলে, আমার বউদির বোনের নাম লীলা। লীলা দত্ত। লায়লা না বলে সংক্ষেপ করে আপনি লীলা বলবেন। সেই নামেই পরিচয় দেব। সুবিধা এই, আপনাদের খোদাতালা কিম্বা আমাদের ভগবান গায়ের উপর জাত দেগে দেন নি। কথাবার্তা এক বাংলায়, চেহারা এক বাঙালির—নামটা নিজেদের এক্তিয়ারে বলে তাই নিয়েই যত কেরদানি।

লীলা, লীলা—বার দুয়েক রপ্ত করে নিল লায়লা। বলে, বেশ হয়েছে। আসল নামের কাছাকাছি। ভুল করে এর কাছে একরকম ওর কাছে অন্যরকম বলে ফেলবার ভয় রইল না।

দরজা খুলে মধুসূদন অবাক হয়ে তাকায় লায়লার দিকে। লায়লা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। সরে গিয়ে সুরেশের পিছনে দাঁড়ায়।

সুরেশ বলে, মাকে ডাক মধু। ঠাকুরঘরে না রান্নাঘরে, না গঙ্গায় ?

কণ্ঠ গভীর হল সুরেশের। বলে, মায়ের আমার মোটমাট তিন জায়গা—গঙ্গার ঘাট, রান্নাঘর, আর ঠাকুর লক্ষ্মীজনার্দন। এর বাইরের দুনিয়া চেনেন না।

মধু বলল, চান করা হয়ে গেছে মার। চন্দন ঘষছেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নবনলিনী বেরিয়ে এলেন। চন্দনের বাটিতে ঘষা সারচন্দন। গন্ধে আমোদ করে তুলেছে। কপাল জুড়ে চন্দন লেপা, পরনে তসরের থান। ঠাকুরঘরের দিকে যাচ্ছিলেন মা।

থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন : কাল সেই সকালবেলা বেরিয়ে গেলি—এত করে বলি, সারাদিন যা করে বেড়াস, রাত্তিরটা বাড়ি চলে আসবি। নইলে ঘুমুতে পারি নে—ছটফট করে মরি।···হ্যাঁ রে, লক্ষ্মী মেয়েটাকে চিনতে পারছি নে তো!

বউদির সেই বোন। উইমেনস হস্টেলে ছিলেন—যাঁর জন্যে বউদি ব্যস্ত হয়ে চিঠি লিখেছেন।

লায়লা ইতিমধ্যে গলায় আঁচল বেড় দিয়ে নবনলিনীর পায়ের গোড়ায় গড় হয়ে প্রণাম করল—পুত্রবধূর বোন হয়ে ঠিক যেমনটি করতে হয়। বাঃ রে, লায়লা জানে দেখি অনেক!

ক্ষতচিহ্নে ভরা ফুলে-ওঠা মুখের দিকে চেয়ে নবনলিনী শিউরে উঠলেন, কী হয়েছে ? অ্যাঁ, কী কাণ্ড করেছে গো!

পার্ক স্ট্রীটে ছিলেন—বুঝতেই পারছ মা। লাঠি পেটা করে তারপরে মড়া ভেবে ফেলে গিয়েছিল।

মানুষ নয়, জানোয়ার। আমাদের জাত হলে কখনও এতদূর পারত না, মুখ দেখে মায়া হত। ওরা বলেই পেরেছে।

বোধ করি আরও বেশি করুণা কাড়ার মতলবে সুরেশ বলল, এই

দেখছ মা, আর শাড়ির নিচের হাতখানা যদি দেখ তাকিয়ে। অদ্ভুত সহ্যশক্তি, তাই অমনি দাঁড়িয়ে আছেন। এতটা পথ হেঁটে চলে এলেন। অন্য কেউ হলে শুয়ে পড়ত মাটিতে, চেঁচিয়ে তোলপাড় করত।

ডান হাতে ধরে রেখেছে জখমি বাঁ-হাতখানা। নবনলিনী তাড়াতাড়ি হাতের কাপড় সরিয়ে দিলেন। ঠাকুরঘরে যাচ্ছিলেন তসরের শুচি কাপড় পরে, ঠাকুরের কথা ভুলে গেলেন। আহা রে, হাতের পাতা থেকে কনুই অবধি ফুলে ঢোল। ব্যাকুল হয়ে বললেন, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, দাঁড় করিয়ে রেখেছিস কোন আক্কেলে এতক্ষণ? এই তুই ডাক্তার?

মায়ের তাড়নার জবাব দেয় সুরেশ: কেমন করে বুঝব যে, জ্বর হয়েছে। নাড়ি ধরে দেখি নি, উনিও কিছু বললেন না।

নবনলিনী আরও রেগে উঠলেন: নাড়ি না দেখিস মুখের দিকে একটিবার তাকিয়ে দেখিস নি? বাড়ি এসে এতক্ষণ ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস, শুইয়ে দিতে পারলি নে? ডাক্তারি না কচু শিখছিস, গোমুখ্যু কোথাকার!

সুরেশ বলে, কোন বিছানায় কোথায় শোবেন, তুমি এসে দেখিয়ে দেবে তো! নয়তো আবার বকাবকি—

হ্যাঁ, বকাবকি করতাম! দাঁড়িয়ে মাথা ঘুরে পড়ুক তাই বলে। অন্য বিছানা না পেলে আমারটা তো রয়েছে ঐ পড়ে।

লায়লাকে জড়িয়ে বুকের মধ্যে নিয়ে তাড়াতাড়ি বিছানায় শুইয়ে দিলেন। তাঁর নিজের বিছানা। দু-চোখ ভরে যায় জলে। চোখ মুছে বলতে লাগলেন, এক শহরে আছিস, ভুলেও কোনদিন বুড়ি-মার কাছে আসিস নি। আজকে কী দশায় এলি মা গো, পোড়া চোখ দিয়ে কেমন করে তাকাই?

শুধুমাত্র গঙ্গাস্নান ছাড়া বাড়ির বাইরে যান না নবনলিনী, কারও সঙ্গে মেশেন না। কবে কোন বয়সে কলকাতা দেখেছেন, এখনও

বোধ হয় ধরে আছেন শহর মোটামুটি সেইরকম আছে। এইটুকু আঘাত দেখেই অধীর হয়েছেন। আঘাতের তাড়সে রাতে একটু জ্বর এসেছে, তাই নিয়ে খামোকা সুরেশকে যাচ্ছেতাই করলেন। আতঙ্ক ছিল লায়লার। এখন লজ্জা। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে।

ঘণ্টা খানেক কেটে গিয়েছে। বার্লি রান্না করে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে বাটি ভরতি করে দিয়ে নবনলিনী আবার এক দফা স্নান করে ঠাকুরঘরে ঢুকেছেন। বাটির একটুও যাতে অবশিষ্ট না থাকে, তদারকির ভার সুরেশের উপর। জুলুম। অতখানি মানুষের পেটে ধরে নাকি? কিন্তু খেতেই হবে, নয়তো বেচারা সুরেশ মায়ের কাছে গালি খেয়ে মরবে আবার। লায়লার জন্য গালি খাবে।

কী কাণ্ড বলুন তো আমায় নিয়ে—

সুরেশ সগর্বে বলে, মা যে!

লায়লার কণ্ঠ একটু বুঝি কাঁপল: আমার মা নেই। ছোট্ট বয়সে মারা গেছেন, মনেও পড়ে না। সত্যিকারের মা কী রকম, জানি নে। কিন্তু উপায় কী তাই বলুন। আরাম করে এমনি পড়ে থাকলে তো হবে না!

সুরেশ বলে, দোষ আপনার। পায়ের উপর পড়তে গেলেন কেন? আপনাদের তো ওরকম করে না। দূরে দূরে নমস্কার সেরে দিলে আধুনিকা ভেবে মা-ও আপনাকে এড়িয়ে যেতেন।

লায়লার কুণ্ঠিত মুখে চেয়ে সামলে নেয় আবার: কি জন্য করলেন সেটা বুঝি। কোন দিক দিয়ে সন্দেহের কিছু না থাকে। ভালই করেছেন অবশ্য। কিন্তু ওই করতে গিয়ে জ্বর ধরা পড়ে গেল।

লায়লাও হারবার মেয়ে নয়। বলে, ওসব কিছু নয়। শুনবেন তবে? শুচিবেয়ে বললেন কিনা—প্রণামের ছুঁতো করে ছুঁয়ে দিলাম। নোংরা হলেন মুসলমানের মেয়ে ছুঁয়ে। খানিকটা শোধ নিয়ে নিলাম।

বেশ করেছেন। শোধ নিতে গিয়ে এবারে মজা টের পান। শুয়ে পড়ে থাকুন দু-দিন চার দিন। পড়ে পড়ে বার্লি খান।

লায়লা বলে, ভাল অষুধপত্তর খাইয়ে শিগগির জ্বরটা সারিয়ে দিন।

আমি? কী দায় পড়েছে! বকুনি খাওয়ালেন আমায় মায়ের কাছে। আমার ডাক্তারির অপযশ হয়ে গেল।

একটু চুপ করে থেকে লায়লা বলে, এই মা কি তখন আর মা হয়ে থাকবেন যদি জানতে পারেন আমার জাত? বড্ড পলকা সম্পর্ক। আমার জাত ধরে কী গালটাই দিলেন! নৃশংস কাজটা হতে পেরেছে আমার জাত বলেই, আপনাদের জাত হলে মায়া হত নাকি!

সুরেশ বলে, বুঝে দেখুন, মা গালি দিলেন—যারা আপনাকে এমনি ভাবে মেরেছে। বললেন মুসলমানের কথা মনে করে, কিন্তু গালি তো আমাদেরই জাতের উপর পড়ল।

লায়লা অধীর হয়ে বলে, জাতের নিন্দে সয় না আমার। কান পেতে শুনতে পারি নে। তর্কে কাজ নেই। আমায় বাড়িতে রেখেই থানায় যাবেন বলেছিলেন—যাচ্ছেন না তো!

তখন কি জানি, জ্বর বাধিয়ে বসে আছেন? জ্বরো রুগিকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমিও গালি খেলাম। গালিতে মার কোন বাছবিচার নেই, নিজের ছেলে বলে রেহাই হয় না। বার্লি খেয়ে আপনার ঘুমবার কথা। ঘুমোন। তারপরে আমি যাব।

ঘুমতে হবে হুকুমমতো?

মায়ের হুকুম যে! নয়তো গালি। কোনটা ভাল, দেখুন ভেবে।

হুকুমে ঘুম আসে না। এ বড় জুলুমবাজি। কায়দার মধ্যে পেয়েছেন কিনা! আপনাদেরই ভয়ে কেঁপেছি কাল দুপুর অবধি। আমি ঘুমিয়ে পড়লে আবার কোন মূর্তি ধরে বসেন, ঠিক কি! থাকুন

আপনি পাহারায়—সমস্ত দিন বসে থাকুন। স্পষ্ট বলছি, আমি ঘুমুব না।

খুব খানিকটা ঝগড়া করল লায়লা, কিন্তু ঘুমিয়েও পড়ল একটু পরে। জ্বরে আর দেহের ব্যথায় কতদূর অবসন্ন হয়ে পড়েছে, বিশ্রামের কী প্রয়োজন, তা সে নিজেই জানত না। সেই ঘুমিয়ে পড়ল, জাগল সন্ধ্যার তখন অল্প একটু বাকি। মধুর কাছে জিজ্ঞাসা করল। ঘুম পাড়িয়ে রেখে সুরেশ বেরিয়েছিল। ফিরেছিল তারপরে একবার। দুপুরের খাওয়া সেরে আবার বেরিয়ে গিয়েছে।

নবনলিনী এসে বার বার গায়ে হাত দিয়ে দেখছেন। সুরেশ দু-তিন রকম ওষুধ এনে দিয়েছে—ঘড়ি দেখে খাইয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। রাত্রি হল। ঘুম আসে না লায়লার—কত আর ঘুমোবে? শয্যায় এপাশ-ওপাশ করছে। সুরেশ বোধ হয় আজ রাত্রে আসবে না. কাজ বেশি ওদের রাত্রিবেলা। তা তো হবেই, ভয়াল সরীসৃপরা অন্ধকারেই দলে দলে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় রাস্তায় তাদের পাহারা দিয়ে ঘুরছে সুরেশরা। কালীপদ মাস্টারকে যেমন বলল—একটুখানি হয়তো চোখ বুজে আছে কোন ফুটপাথের উপরে গ্যাসপোস্টে হেলান দিয়ে। লায়লার মাথার নিচে বালিশ ছিল, নবনলিনী আবার কখন দুই পাশবালিশ এনে দু-পাশে দিয়েছেন। আরাম হবে আহত মেয়ের। নিজে শুয়েছেন মেঝেয় মাদুর পেতে তার উপরে কম্বল বিছিয়ে। আলো-নেভানো ঘরের মধ্যে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে লায়লা, আর মনে মনে হাসে : জাত গেল গো মা-জননী! এত নিষ্ঠায় জাতধর্ম বাঁচিয়ে আছ, গেল সমস্ত বরবাদ হয়ে। জানতে যদি কার জন্যে এত করছ, যদি আমার জাতের খবর রাখতে!

আর ভাবছে, মোল্লা সাহেবের কানে গেলে পুলকে হয়তো বা ডগমগ হবেন—প্রাণে বেঁচে গিয়ে একটা বিষম ভাল কাজ করেছি, একজন কাফেরের জাত মারলাম।

চৌদ্দ

সকালবেলা ঢুলতে ঢুলতে সুরেশ ফিরল। অর্থাৎ ফুটপাথে চেপে বসে একটু-আধটু চোখ বুজবারও ফুরসত হয় নি কাল রাত্রে। লায়লাকে দেখে আরক্ত চোখ আনন্দে বিস্ফারিত হল: বা রে, হাতের ফুলো একেবারে নেই। দেখলেন আমার ডাক্তারি? মা তো গোমুখ্যু আরও কত কি বলে দিলেন! আপনিও মনে মনে ভাবলেন, হয়তো বা সত্যি ভাই। উঁচু করে তুলুন দেখি হাতটা। লাগছে না, একটুও ব্যথা নেই—কি বলেন?

ব্যথা একটু আছে বই কি, হাত তুলতে গিয়ে লাগে। কিন্তু ছেলেমানুষের মতন এই উল্লাস আর পরিতৃপ্তির মধ্যে সে-কথা প্রকাশ করতে ইচ্ছে হয় না। হাসিমুখে লায়লা চুপ করে থাকে।

সুরেশ জাঁক করে: ডেকে কথা বলে আমার ওষুধ। দেখলেন তো?

দুষ্টুমির সুরে লায়লা বলে, লড়াই দুনিয়ার এই উপকারটা করেছে। যক্ষ্মা ক্যানসার আর এক-শ গণ্ডা ব্যাধিতে ভুগে ভুগে রোগি মরে মরুক, কিন্তু একটা অঙ্গ একেবারে ছিঁড়ে পড়ে গেলেও মানুষ দু'দিনে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। এমন সব ওষুধ বেরিয়েছে—ওষুধে সত্যি সত্যি ডেকে কথা বলে। এর পরে গলা কেটে দু-খানা করে ফেললেও জোড়া দেওয়া যাবে বোধহয়। করতেই হবে। মানুষ না থাকলে আবার নতুন লড়াই বাধানো যাবে কাদের নিয়ে?

তারপর বলে, থানায় গিয়ে খোঁজ নিয়েছিলেন কাল? আমায় পাঠিয়ে দেবার কি ব্যবস্থা হল?

হেসে আগের কথারই কী জবাব দিতে যাচ্ছিল সুরেশ। হাসি থামিয়ে বলে, ভয় হচ্ছে আপনার এখানে?

না, কিসের ভয়? মা ছোরা তুলবেন না, আপনিও বন্দুক তাক করবেন না আপনাদের দৌড় বুঝে নিয়েছি।

হাসল লায়লা। বলে, ভয় নয়—কষ্ট বড্ড। এত নরম বিছানায় আমি শুই নে। বুড়োমানুষ মেঝেয় কম্বল পেতে পড়ে থাকেন, খাটের উপরে শুয়ে ঘুম হয় না আমার। ঘুমের ভিতর উঁ-আঁ করেছি কি তক্ষুণি মুখের উপর ঝুঁকে এসে পড়েন। এ-সমস্ত পারি নে আমি। আর আপনি কী সাংঘাতিক লোক—এই মাকে নিয়ে কত ভয় দেখিয়েছিলেন। শুচিবেয়ে মানুষ—ছোঁবেন না, কথা বলবেন না, ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে হাঁটবেন, আরও কত কী!

সুরেশ বলে, কী জানি আমারও তো নতুন লাগছে। আমাদের বেলা এমন দেখি নি।

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে সুরেশঃ বাড়িটা দেখছেন মরুভূমির মতো খা-খা করছে। আমার ভাইঝি দুটো থাকলে গানে নাচে হাসি-হুল্লোড়ে কান পাততে দিত না। মেজবউদি আমার এই মাকে চিনতে পারেন নি। অধৈর্য হয়ে সকলকে নিয়ে সরে গেলেন। বাধা দিলেন না মা, একটি কথা বললেন না—কিন্তু আমি জানি, কত বড় ব্যথা তাঁর মনের মধ্যে। হতে পারে, আপনাকে আঁকড়ে ধরে সেই ব্যথা খানিকটা এখন ভুলতে চাচ্ছেন।

লায়লা বলে, অথচ দেখুন কত ঠুনকো এই ভালবাসা। যে মুহূর্তে জাতের পরিচয় পাবেন, গঙ্গাস্নান করবেন, পণ্ডিতের কাছে ছুটবেন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিতে। ছদ্ম-পরিচয়ে রয়েছি—উনি যা জানেন, আমি তা নই। জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে চেহারা পালটে যাবে।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, রূপকথায় শুনি পরমাসুন্দরী রাজরাণী লহমার মধ্যে রাক্ষসীর চেহারা নিয়ে দাঁড়ায়। হয়তো বা তেমনি হয়ে যাবেন। চোখে ফুটবে ঘৃণা আর আক্রোশ, হাতে উঠবে লাঠি। যে লাঠিতে আমার আশি বছুরে থুত্থুড়ে নানীকে মেরে ফেলেছে, যে লাঠির ঘায়ে এক ফোঁটা নীলুর মাথা ফেটে ঘিলু ছিট্‌কে পড়ল। উঃ, সে কথা ভাবতে পারি নে আমি, পাগল হয়ে উঠি।

কবে এখান থেকে পালাতে পারব, তাই বলে দিন। বলুন এক্ষুণি।

বলতে বলতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। যেন ভিন্ন মানুষ। মেসের সেই [illegible]বেলার মতন। সুরেশ তাড়াতাড়ি বলল, থানায় গিয়েছিলা[illegible]। কথাবার্তাও হয়েছে। থানাওয়ালারা গাড়ি এনে আপনাকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু থানার গাড়ি পাড়ার মধ্যে আনা চলে না। ঠাণ্ডা মাথায় বুঝে দেখুন সমস্ত। যা করতে হবে অতি গোপনে—লোকে টের না পায়। আপনি তো চলে গেলেন, পাড়ার লোকে তারপরে আমাদের উপর শোধ তুলবে—জেনেশুনে কী জন্যে আশ্রয় দিই আপনাকে ?

লায়লা চুপ করে শুনে যাচ্ছে। সুরেশ বলে, গোপন রাখব মায়ের কাছেও। টের পেলে রাক্ষসীর মূর্তি তিনি ধরবেন না, এটা জেনে রাখুন—ঠিক উল্টো। যত মন্দই হোক, সংস্কার একটা এত কাল ধরে লালন করে আসছেন। সংস্কারের খাতিরে আপনার উপর জোরজবর করবেন না—ঝেড়েই ফেলবেন। কিন্তু মনে মনে বিষম কষ্ট হবে ওঁর। আমার মাকে আমি জানি—ভেবে দেখুন ওঁর কথাটা।

লায়লা বলে, তা হলে উপায় কি! চিরকাল এমনি মুখ লুকিয়ে এখানে থাকব? তা-ও তো হবে না। কোনদিন হয়তো জলের বদলে পানি বলে বসব। ক্যাঁক করে ধরে বসবেন। দিনরাত কত সামাল থেকে পারা যায়!

সুরেশ একটুখানি ভাবল। বলে, আর একটু সেরে উঠুন আপনি। ধরুন, বেড়াতে বেরলাম একদিন—বেড়াতে বেড়াতে আপনাকে থানার হেপাজতে দিয়ে এলাম। মাকে বলব, তুমি যেতে দিচ্ছ না বলে ট্যাক্সি ডেকে জোর করে উনি স্টেশনে চলে গেলেন। নদে জেলায় ওঁদের যে পৈতৃক বাড়ি, সেখানে গিয়ে উঠবেন। মা আর কি করবেন—বেপরোয়া একগুঁয়ে বলে খুব একচোট গাল

পাড়বেন আধুনিকতার নামে। চুকে-বুকে গেল। সব দিক ভেবে আমি তো মনে করি, এই ব্যবস্থা ভাল। আপনি কি বলেন ?

লায়লা বলে, সে তো আজও হতে পারে। ব্যথা-ফুলো প্রায় সেরে গেছে। এখনই চলুন বেড়াতে বেরিয়ে যাই।

সুরেশ হেসে বলল, মাকে তবে বলে দেখুন। বাড়ি থেকে এক-পা বেরুনো তাঁর হুকুম ছাড়া হবে না।

ডাক্তার হিসাবে আপনি বলুন না, গঙ্গার ধারে খানিকটা ঘুরে আসা উচিত। স্বাস্থ্যের জন্য দরকার।

ওরে বাবা! গালি খেয়ে মরব। ছেলের ডাক্তারির উপরে মার একেবারে আস্থা নেই। দেখলেন না কাল ?

তারপর অনুনয়ের সুরে বলে, উতলা হবেন না। থেকে যান দুটো-তিনটে দিন। বাইরে বেরবার অবস্থা এখনো হয় নি, হাত-পা মেলে কয়েকটা দিন পুরো বিশ্রাম নেবার দরকার।

পনের

তাই হল। বেশ তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাচ্ছে লায়লা। ক'দিন থেকে, কী জানি, নবনলিনীকে মা বলে ডাকছে। বেড়াবার নাম করে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবটা লায়লা মনের সঙ্গে নিতে পারছে না। বলল, যাই এবারে মা। দেশের বাড়িতে যাব, ওদিকে কোন দাঙ্গাহাঙ্গামা নেই।

নবনলিনী বললেন, যাবে তো বটেই। চিরকাল থাকতে এসো নি, সে জানি। ভাল হও, তার পরে চলে যাবে।

ভাল তো হয়েছি। দেখুন না, এই দেখুন। কত জোরে হাত দোলাচ্ছি, একটুও লাগে না।

হাত ধরে ফেলে নবনলিনী তাড়া দিয়ে উঠলেন : থাক, বাহাদুরির

দরকার নেই তো। চলে যাবার টানে দাঁত-মুখ চেপে ব্যথা সহ্য করে হাত দোলানো। ও আমি বুঝি। ভাল হয়ে গেলে আমি এমনি টের পাব, প্রমাণ দিয়ে বোঝাতে হবে না।

হতাশ হয়ে বসে পড়ে লায়লা বলে, আমার হাতের ব্যথা আপনি বলে দেবেন সেরেছে কিনা? তবে আমায় কোন দিন ভাল হতে হবে না।

ভঙ্গি দেখে নবনলিনী হেসে ফেললেন: এতগুলো ছেলেমেয়ে নিজের হাতে বড় করলাম—আমি বলতে পারব কেন? পেট থেকে পড়েই তোরা এক এক মহাপণ্ডিত হয়েছিস, তোদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে তবে বলতে হবে।

লায়লা হেসে বলে, পারলেও কি বলবেন সে কথা? যাওয়া আমার আটক হয়ে রইল।

নবনলিনী বলেন, শুয়ে বসে ভাল লাগছে না, সোজাসুজি বল তাই। বেশ তো, এটা-ওটা হাত-আরানি কর, সময় কেটে যাবে। ঐ চন্দনপাটা রয়েছে, সারচন্দন ঘষে ফেল দিকি খানিকটা।

লায়লা স্তম্ভিত হয়ে যায়: আমি?

হাত সেরে গেছে বলছ, তার একটা পরখ হোক। চন্দন ঘষা তোমাদের মতন কলেজে গিয়ে শিখতে হয় না। ঘষে গেলেই হল।

একটু থেমে ক্লান্ত সুরে আবার বলেন, কাল একাদশী গেছে। বুড়ো হয়ে গেছি, একলা হাতে সকল দিক খাটতে হয়। তুমি যে ক'টা দিন আছ, করে দাও। তারপরে আমার দুই নাতনি এসে যাচ্ছে। ভেবে রেখেছি, এই সব কাজের ভার তাদের উপর দিয়ে দেব।

লায়লা সেদিন বড্ড হাসিখুশি। সুরেশ বাড়ি ফিরলে হাসতে হাসতে বলল, ঠাকুরঘরে ঢুকে পড়েছিলাম। ছুঁয়ে-লেপে সমস্ত বরবাদ করে দিয়েছি।

আদ্যোপান্ত শুনল সুরেশ। বলে, বুঝতে পারছি। মনে মনে মার সেই অনেক দিনের ব্যথা। বউদিকে কোন দিন মা ঠাকুর-সেবার কাজে ডাকেন নি, এড়িয়ে চলতেন। সেই সব অভিমান নিয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে কাঁহা-কাঁহা মুলুকে গিয়ে ওঁরা পড়ে রইলেন। আপনি হলেন কিনা সেই বউদির বোন, বোনকে ডেকেডুকে এত দিন পরে খানিকটা যেন শুধরে নিচ্ছেন।

লায়লা প্রশ্ন করে, এড়িয়ে চলতেন কেন আপনার বউদিকে?

ওই জাতবেজাতের ব্যাপার। বউদির জাতে বুঝি একটু খুঁত ছিল। সেসব পুরাণো কথা শুনে আপনার লাভ নেই, আমারও বলতে ভাল লাগবে না। কিন্তু কী ফ্যাসাদ বলুন দেখি? একচক্ষু হরিণের মতো এ বিপদ ভাবতে পারি নি।

বিপদ শুনে লায়লার মুখ শুকোয়। সুরেশ বলে, ঠাকুরঘরে মা টেনে নিয়ে গেলেন। ধর্মে বোধ হয় গুণাহ্‌ হল আপনার।

যাক, লাঠিসোটার বিপদ কিছু নয়। সোয়াস্তি পেল লায়লা। বলে, মার হুকুমে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম সত্যি। কেমন করে কি করব ভেবে পাই নে। মা বকে উঠলেন: কলেজি বিদ্যে খাটাতে হবে না, ঘষে গেলেই হবে। দেখলামও তাই—যত ঘষি, দিব্যি বাস বেরোয়—আরামে মন ভরে যায়।

সুরেশেরও মনের সঙ্কোচ কেটে গেছে। বলে, আরাম বেরিয়ে যাবে মোবারক মোল্লা যদি শুনতে পান। ঠাকুরঘরে গিয়ে চন্দন ঘষেছেন—একঘরে করবেন ওঁরা আপনাকে।

লায়লাও ঠিক তেমনি সুরে বলে, শুনতে পেলে মোবারক মোল্লা দরবার বসিয়ে শিরোপা দেবেন আমায়। কোন মুলুকে মসজিদ ভেঙে নাকি নৈরেকার করেছে, মোল্লা সাহেব টেবিলের উপর নমুনার একখানা ইট রেখে দিয়েছেন। তারই তো বদলি হল। অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়ে হিন্দুর জাত মারার কত গল্প শুনেছেন, সেই হিন্দুর ঠাকুরের অবধি আমি জাত মেরে দিয়েছি। আমার একলার ক্ষমতায়।

সুরেশ হেসে বলে, ভোগান্তিগুলো যা হয়েছে, তা-ও এই সঙ্গে বলবেন। পশার আরও বাড়বে। কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল ছিটোতে হল গায়ে মাথায়। হস্টেলে বসবাসের দরুন চামচে খানেক গোবর খেতে হল কিনা সঠিক জানি নে। এত কাণ্ড করে তবে ঠাকুরঘরে ঢুকতে হয়েছে। আমার মাকে আমি জানি নে? বলুন, সত্যি কি না?

বলতে বলতে সহসা স্তব্ধ হয়ে যায়। গভীর কণ্ঠে বলে, ভাল করেছেন আপনি। জানি না কী করে এত সংস্কারমুক্ত হলেন। খুব কম জনেই পারে এমন।

এখন আর হাসিরহস্য নয়, অন্তর দিয়ে বলছে। লায়লাও গম্ভীর হল: সত্যি বলছেন, ভাল করেছি আমি?

সুরেশ বলে, সামান্য মানুষ আমি, ঠাকুরের জাত নিয়ে দুর্ভাবনা করি নে। আপনাকে মা ভালবেসেছেন। মা জানেন, হিন্দু-ঘরের মেয়ে আপনি। ঠাকুরঘরের ঐ অভিনয়টুকু যদি না করতেন, আশাভঙ্গ হত মার। লাহোর থেকে ওঁরা আজও এসে পৌঁছলেন না, সেজন্য মার মন ভাল নয়—তার উপরে আপনার পরিচয় প্রকাশ পেলে বড় মর্মান্তিক হত। আপনি তা হতে দেন নি। আপনি বড় ভাল, ভারি দরদ আপনার। কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব জানি নে।

প্রশংসা লায়লার ধাতে সয় না। এমন আবেগ ভরে সুরেশ বলছে—চপল হাসি হেসে সে কথা বন্ধ করে দেয়। মুখ-চোখ নাচিয়ে কৌতুক-কণ্ঠে বলে, জানাবেন কৃতজ্ঞতা? কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কিছু বুঝি বলতে চান? 'আপনি' 'আপনি' না করে তা হলে 'তুমি' শুরু করুন দিকি।

মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে। বলে, সংস্কারমুক্ত হয়ে আমি এত সব ভারি ভারি কাণ্ড করলাম, আপনি এটুকুও পারবেন না? দেখুন, মা কিন্তু অনেক ভাল আপনার চেয়ে। 'তুমি' বলতে

বলতে 'তুই'ও বলেন এক এক সময়। তখন ভাবি, কবে যে ঐ 'তুমি'টুকু একেবারে বন্ধ হবে!

সুরেশ বলে, মা যে! মায়ের মুখে যা ভাল লাগে, সকলের পক্ষে তা মানাবে কেন? আসবেই না মুখে।

লায়লা বলে, আমি তো বয়সে ছোট আপনার চেয়ে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, মৃত্যু কাকে বলে সে আমি ভাল করে জানি। আপনি-তুমির বাইরেই তো চলে যাচ্ছিলাম। বেঁচে রইলাম আপনার জন্যে। নতুন করে জীবন পেলাম। সেই তখন থেকে আরও কত ছোট হয়ে গিয়েছি, বুঝে দেখুন।

ছেলেমানুষের মতো খিল-খিল করে হেসে উঠল। সত্যি সত্যি সে শিশু হয়ে গেছে আবার যেন। খুব এক চোট হেসে নিয়ে লায়লা স্তব্ধ হল। বলে, বিচলিত হবেন না, আমি জানি সে হবার নয়। লায়লা না হয়ে সত্যিকার লীলা হলে হয়তো বা 'তুমি' চলত। জাতের বেড়া মানুষের মাঝখানে। সংস্কারের বেড়া, মোল্লা-পুরুতের বেড়া, পূবমুখো হয়ে পূজো আর পশ্চিমমুখো হয়ে নমাজের বেড়া।

সুরেশ সেই সঙ্গে আরও জুড়ে দেয়: এমন কি, ছেলেমেয়ের নাম রাখার মধ্যেও। বাংলাভাষার উপর প্রাণ-ঢালা দরদ, ভাষার জন্যে জান কবুল—ছেলেমেয়ের নাম কিন্তু ভিন্ন ভাষার এলাকা থেকে। শুধুমাত্র নাম শুনেই যাতে বোঝা যায় গোষ্ঠি আলাদা।

লায়লা বলে, ইংরেজি ভাষাটা এদিক দিয়ে ভাল। 'তুমি' 'আপনি'র ঝগড়া নেই। আপনি ইংরেজিতে কথা বলবেন আমার সঙ্গে। 'আপনি' 'আপনি' বলে যখন সমীহ করবেন, আমি ধরে নেব 'তুমি' বলছেন।

সুরেশ ম্লান হেসে বলে, বলাবলি ক'দিনেরই বা! পার্ক-সার্কাসে কিম্বা দেশে-ঘরে যেখানে হোক চলে যাবেন—আজকে না হল তো কাল। দু-জাতের দাঙ্গাহাঙ্গামাও এইখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে না।

কোথায় থাকি, কোথায় যাই—জীবনে কোন দিন আর আমাদের দেখা হবে না।

সকালবেলা এই কথাবার্তা, হাসাহাসি-অভিমান-আবদার। সুরেশ যথারীতি বেরিয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে বিষম কাণ্ড। উপরের ফ্ল্যাটের একটি লোকের কৌতূহল লক্ষ্য করা যাচ্ছে ক'দিন থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেরবার মুখে জানলার দিকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে যান। দাঁড়িয়েও থাকেন সময় সময়। লায়লার নজরে পড়ে জানলাটা বন্ধ করে দিয়েছে, কোন সময়ে আর খোলে না। সেই মানুষটা আজ মা মা—করে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লেন: থার্মোমিটারটা দিন একবার মা, খোকার টেম্পারেচার দেখব।

মা ডাকছেন নবনলিনীকে উদ্দেশ করে। মাতৃপ্রাণ পুত্রটির এতদিনের মধ্যে সাড়া পাওয়া যায় নি। মা কোথায় রে মধু? —বলতে বলতে একেবারে লায়লার ঘরের মধ্যে।

নবনলিনী গঙ্গাস্নানে গিয়েছেন। রোজই যান—আজ অন্তত দশ বছর ধরে। পাড়াসুদ্ধ জানে, উপরের উনিই জানেন না শুধু! সামনাসামনি দাঁড়িয়েছেন। এবং তরুণী মেয়ের ঘরে ঢুকে তিলেক সঙ্কোচের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। বরঞ্চ টিপে টিপে হাসছেন।

লায়লা তো আপনি। এখানে রয়েছেন?

নিরর্থক বুঝেও ইঁদুরে থাবা তোলে শিকারি বিড়ালের দিকে। লায়লা বিস্ময়ের ভান করে বলে, আপনার ভুল হচ্ছে।

ভুল? হতে পারে। চশমা অনেক দিন আগে নেওয়া, বদলাতে হবে। লায়লা নন—আপনি কে তবে?

লীলা—লীলা দত্ত আমার নাম।

বটে! আমি অমল সাধুখাঁ—আমাকেও বোধহয় দেখেন নি

কখনো। কিন্তু আমি এক লায়লাকে জানি। বর্ষামঙ্গল পালা করলেন—গানবাজনার তালিম দিতে সেই সময় কলেজ থেকে আমায় নিয়ে গিয়েছিল। খুব ভাল গান করেন সেই লায়লা, ভারি মিঠে গলা। তখন দাঙ্গার সময় নয়। এখন শুনতে পাই, হিন্দুপাড়ায় লায়লারা সব লীলা হচ্ছেন, মুসলমানপাড়ায় জয়নারাণরা হচ্ছেন জয়নুদ্দিন। হতেই হবে, যে বিয়ের যে মন্তোর।

হাসতে হাসতে অমল ফিরে চলে যাচ্ছেন। লায়লার এখন এই মুহূর্তে একটুও ভয়ের ভাব দেখানো চলবে না। তা হলে সর্বনাশ! বলে, থার্মোমিটার নিতে এলেন, কই, নিয়ে যান।

ও হ্যাঁ, দিন।

সেই থার্মোমিটার দেবার সময় আরও চোখোচোখি হল। অসহায় শিকারকে বাঘ যখন কবলের মধ্যে পায়, এমনি বুঝি তার জ্বালাময় চোখ।

নবনলিনী গঙ্গাস্নান করে এলে লায়লা বলল, আমি চলে যাব। আজকেই।

আবার কি হল? এখানে জল-বিছুটি মারছে কে তোমায়?

সেই আগেকার মতন জবাব। চলে যাবার কথা পাড়তে দেবেন না। এ তো বড় মুশকিল হল! কিন্তু অমল সাধুখাঁর কথাবার্তার পর কেমন করে সে চুপচাপ থাকে? বলে, অনেক আগেই আমার দেশে গিয়ে পৌঁছবার কথা। অত বড় হাঙ্গামা, তার পরে এখানে এসে আবার জ্বরে আটকে গেলাম। বাড়ির লোকে কোন খবর পাচ্ছেন না।

তা বটে, তাঁরা ব্যস্ত হচ্ছেন। খাম-পোস্টকার্ড আছে—লিখে দাও যে, অসুখ সেরেসুরে চলে যাবে।

লায়লা বলে, সেরেই তো গেছি—

নবনলিনী রীতিমত চটে উঠলেন: বারে বারে এক কথা আমার ভাল লাগে না বাছা। ভালমন্দর বুদ্ধি থাকলে তো! ভাল কিসে

হবে বুঝতে পারলে পার্ক স্ট্রীটে পড়ে থেকে মার খাবে কেন? আগেই বেরিয়ে পড়তে, এমন দশা হত না।

সেই আদি-পর্ব মহাভারতের শুরু আবার। দিনে রাতে অবিরত যা শুনতে হচ্ছে। লায়লা জেদ ধরে বলে, যেতেই হবে আমায়। সুরেশবাবু আসুন বাড়ি—আজকেই তিনি ব্যবস্থা করে দেবেন।

ভ্রূকুটি করলেন নবনলিনী। বলেন, এসেছ খানিকটা নিজে ইচ্ছে করে। কিন্তু যেখানে এসেছ, যাওয়াটা সম্পূর্ণ তাদের ইচ্ছেয়। দুয়োর ধরে আটকাব। ক্ষমতা থাকে, ধাক্কা মেরে যেও চলে।

অধীর কণ্ঠে লায়লা বলে, জোর করে আটকানো হচ্ছে কিন্তু—

হচ্ছেই তো। শরীর হয়তো একটুখানি সেরেছে, কিন্তু মাথা তোমার খারাপ হয়ে গেছে। পাগলকে আটকে রাখতে হয়।

রায় দিয়ে ভিজে কাপড় সপসপ করে নবনলিনী চলে যাচ্ছিলেন। দরজা অবধি গিয়ে ভেঙে পড়লেন। দু-চোখে জল ছাপিয়ে পড়ে। বললেন, লীলা, তুই কি পাথর? আমার নরেশের কোন খবর নেই। নানান ভয়ের কথা শুনি। একলা থাকলে পাগল হয়ে উঠি। সুরেশটা তো পথে পথে রাত্রিদিন। তুই আছিস —তোর সঙ্গে বকাঝকা করে তোর জন্যে এটা-ওটা কাজ করে কোন রকমে তবু মনের ভাবনা ভুলে থাকি। তুই চলে যাস নে মা। তা হলে কী নিয়ে থাকব!

ষোল

মায়ের এই দশা, আর বাড়ির ছোটকর্তা ওদিকে পথে পথে পরহিত করে বেড়াচ্ছেন। সমস্তটা দিনের মধ্যে আজ বাড়ি আসার ফুরসত হল না। রাত্রিবেলা বেশি কাজ পড়ে, তখন তো আরও হবে না। ভাবতে গিয়ে লায়লা দিশা পায় না। মন খুলে দুটো কথা বলবে,

সে মানুষ নেই। অমন সাধুখাঁ লোকটা দৃষ্টিতে সঙ্কটের পূর্বাভাস দিয়ে গেল—সে এখন কি করবে, কোথায় পালাবে কোন্ কৌশলে?

খাম নিয়ে লিখল একখানা চিঠি। দেশেঘরে যাওয়া—যেখানে সৎমা রয়েছেন—এক কথায় সেটা হবে না। বিশেষ এই ডামাডোলের দিনে। জায়গাটা একেবারে অজানা, লায়লা যায় নি কখনো সেই গ্রাম অঞ্চলে। অতএব লিখল চিঠি ঝাউতলার মোবারক মোল্লাকে: বেঁচে আছি, রয়েছি এই ঠিকানায়, যা করবার করুন এসে মোল্লা সাহেব—

চিঠি লিখে মধুকে দিয়ে দিল ডাকে ফেলতে।

ভাবছে নবনলিনীর কথা, সুরেশের কথা। এঁদের কি—আমি চলে গেলে কে কি করবে এঁদের! স্রেফ বেকবুল যাবেন: বুঝব কেমন করে আগে? মেয়েটা মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিল। বুঝলে কি আর চৌকাঠ পার হতে দিই?

মোবারককে চিঠি লেখা ছাড়া অন্য কিছু মাথায় আসে না লায়লার। মরতে পারব না, কেন মরব? দুনিয়া জুড়ে এত মানুষ বেঁচে থাকবে, আমি কি জন্যে বঞ্চিত হব জীবন থেকে? কী অপরাধে? সাধুখাঁ সময় বেশি দেবে না—চোখের ক্রূর দৃষ্টি দেখে বোঝা গেল। লাঠি-সোটা ছোরা-বন্দুক নিয়ে এসে পড়বে। এ-পাড়ার এরা অনেক হুঁশিয়ার, জোড়াঘাটে হাত পাকিয়েছে—দেখেশুনে ষোলআনা নিঃশয় না হয়ে লাস ছেড়ে যাবে না। ছাড়বেই না মোটে—ঠ্যাং ধরে টানতে টানতে ঠেলাগাড়িতে তুলে গঙ্গায় ছুঁড়ে দিয়ে আসবে। গঙ্গা একেবারে পাশে, সেদিক দিয়ে ভারি সুবিধা। লাস নিয়ে শনাক্ত করবার উপায় রাখবে না।

একদিনের দুর্ভাবনায় লায়লার আবার সেই গোড়ার দিনের চেহারা। সকালবেলা সুরেশ ফিরল। এক-গলা কথা জমে আছে—

তার কোনটা আগে বলে, কোনটা পিছনে।...বলে, আপনাদের উপরের সাধুখাঁ লোকটা আমার চেনা। গানের সুর দিতে গিয়েছিল, সেই সময় বড্ড দরদ দেখাত আমার উপর। ভাল ভাল কথা বলত। হাত টেনে ধরে দেখাতে গেল কোন্ পজিশন নেব গান গাওয়ার সময়টা। যাচ্ছেতাই ধমক দিলাম। সবাই হেসে উঠল। সে অপমান মনে মনে পুষে রেখেছে। কায়দায় পেয়েছে, এবারে শোধ নেবে।

সুরেশও শঙ্কিত হয়েছে। ফর্সা মুখ পাংশু। বলে, পাড়ায় ওর মস্ত বড় দল। দলটা কনসার্টের—এখন তবলা-বাঁশি ফেলে ডাণ্ডা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সত্যিই থাকা চলবে না আপনার। একটা দিনও নয়।

ব্যাকুল হয়ে লায়লা বলে, আমি কি করব! মা তো শাসিয়ে গেলেন, দরজা আটকে দাঁড়িয়ে থাকবেন। তাঁর কাছে খুলে বলতেও পারি নে—

দরজার নিচে নামলেই তো হল না! সেখানে আরও বেশি ভয়। যত গুণ্ডা ওদের দলে। তাদের কি আর বলে নি আপনার কথা? নিশ্চয় পথে নজর রেখেছে। এমনি তবু বাড়ির ভিতরে, পথে পা দিলে টুঁটি টিপে ধরবে।

এমনি সময় ট্যাক্সি দাঁড়াল বাইরে। আকাশ-ফাটা কান্না। বিধবার বেশে অমলা এসে আছড়ে পড়ল উঠানে। তার কোলের মধ্যে ইরা। সুরেশ ছুটে গেল। নবনলিনী সুজির কড়াই নামিয়ে রেখে এদের চায়ের জল চাপাচ্ছিলেন, তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল, তারপরে এক ছুটে ঠাকুরঘরে গিয়ে দড়াম করে দরজা এঁটে দিলেন।

আর লায়লা ঘরের মধ্যে কোনখানে লুকবে, দিশা পায় না। কোন দেয়ালের গায়ে, কোন পাতালের তলায়?

সুরেশ আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে হঠাৎ যেন জেগে উঠল। ঝড় আসন্ন। রাস্তায় ঠাসাঠাসি লোক। সুরেশ ইরার কাছে গিয়ে হাত

ধরে টানল: শোন ইরা। একটা কাজ করতে হবে মা, আয় এদিকে।

অমল সাধুখাঁ উপর থেকে ইতিমধ্যে নেমে এসেছে। তার কনসার্টের দল বাইরে। বীরত্ব জাহির করছে—জোড়াঘাটের আধাআধি কাজ নাকি তাদের হাতের। বীরবৃন্দ বাইরের দরজা ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

অমল চিৎকার করছে, ভাই-ভাইঝিকে কোতল করল, আর এমনি মহাপ্রাণ আমরা—তাদেরই একটিকে মহারানীর মতো অন্দরে শুইয়ে সেবা দিচ্ছি। থুঃ—থুঃ! সুরেশবাবু ছুঁড়ির চেহারাই দেখলেন—জাত ধরে ওরা কী ধুন্দুমার করছে, সেটা ভেবে দেখলেন না?

জনতার গর্জন ওঠে: কোথায় আছে বের কর। নখের বদলে নখ, দাঁতের বদলে দাঁত। রক্তের বদলে রক্ত।

নরেশ ডাক্তারের ছোট মেয়ে ইরা—বসন্তে ঝাঁঝরা-মুখ কুরূপ কুৎসিত ইরা বারান্দার প্রান্তে চুপি চুপি সুরেশকে বলে, তাই কাকামণি, ওরা ঠিক বলেছে। স্টেশনে আবদুল-দাদার রক্ত দেখে এসেছি। ঘুষির পর ঘুষি মারছে, রক্ত দরদর করে পড়ছে। মাসিকে আমরা কিছুতে ছাড়ব না।

বের করে দাও শিগগির। নয়তো বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়বে মানুষ এবার। মারবে না, কাটবে না—হাত-পা-মুণ্ডু ছিঁড়ে ছিঁড়ে কুকুর-শকুনের মুখে দেবে।

লায়লা বেরিয়ে দাঁড়াল। কিছুই যেন বুঝতে পারে না, সম্মোহিত হয়ে আছে। অথবা ঘুমিয়ে স্বপ্নের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে শতেক চক্ষুর সামনে।

ইরা কেঁদে উঠল, মাসি ইনি—আমাদের লীলা মাসিমা। আমি চিনি মাসিকে। না কাকামণি?

কান্নাকাটির পর ক্লান্তিতে অমলা থেমেছিল একটু। চোখ বুঁজে ছিল। লীলার নামে চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকায়। গর্জন

করে ওঠে কেশর-ফোলানো সিংহীর মতো : না, বোন নয় আমার। মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা।

ইরা তবু বলছে, মাসিই তো! মা, তুমি চিনতে পারছ না। বলে দাও না কাকামণি। মা তুমি আর একবার চেয়ে দেখ ভাল করে।

খিল খুলে গেল ঠাকুরঘরের। নবনলিনী বেরিয়ে এলেন। স্তব্ধ শোকাহত মূর্তি। সকলের দিকে চেয়ে বললেন, আমার সর্বনাশের মধ্যে হল্লা কোরো না তোমরা অমন ভাবে। আমি চিনি ভাল করে। আমার ছেলে গেছে, নাতনি গেছে। আমার এমন বউমা—শোকে তাপে তারও মাথার গোলমাল। মায়ের পেটের বোন চিনতে পারছে না।

পক্ষীমাতার মতো লায়লাকে বুকের মধ্যে করে নিলেন। বললেন, এখানে কেন মা? চলে আয় তুই আমার সঙ্গে।

ঠাকুরঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে দড়াম করে আবার দরজা দিলেন।

* * * *

অনেক পরে দুপুরবেলা মোবারক মোল্লা এলেন। সঙ্গে লোকজন আর পুলিশ। চিঠি পেতে দেরি হয়েছে, পেয়েই ছুটেছেন। বাড়ি এখন শান্ত। একটু-কিছু খেয়ে লায়লা কলতলায় হাত ধুচ্ছে। মোবারক সামনে চলে এলেন : চল। কোন ভয় নেই। আর্মড-পুলিশ সঙ্গে, আর কেউ আটকাতে পারবে না।

লায়লা বলে, আটকে রেখেছে কে বলল? সেই রকম কি দেখছেন? ভাবী এসে পড়েছেন, আজকে আমি যাব না। আপনার সঙ্গে তো নয়ই।

মোবারক আগুন হয়ে বলেন, খামোকা তবে চিঠি লিখে পাঠালে কেন? কী দরকার বল?

দরকার একটু আছে—

দু-হাতের কাচের-চুড়ি দু-গাছা খুলল। বলে, এ চুড়ি সেই

ঝাউতলার বাড়িতে আপনি দিয়েছিলেন। মনে পড়ে? মামুর নাম করে দিয়েছিলাম—আমার উদার আপনভোলা মামু। চুড়ি পরে মেয়েমানুষ হয়ে মামুকে অন্দরে ঢুকতে বলেছিলেন। আপনার চুড়ি ফেরত নিয়ে যান মোল্লা সাহেব।

বলতে বলতে গলা প্রখর হয়ে ওঠে, দু-ফোঁটা আগুনই বুঝি গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়ে: কাপুরুষ আপনারা—মানুষে-মানুষে তফাত হবার কথা গলা ফাটিয়ে যাঁরা প্রচার করেন। চুড়ি পরে আপনারাই অন্দরে ঢুকে পড়ুন। মানুষে যেন মুখ না দেখে। মানুষ সোয়াস্তিতে থাকুক, মানুষ বাঁচুক।

মোবারক মোল্লাও বিস্তর অকথা-কুকথা বলে পালটা শোধ তুলে চলে গেলেন। লায়লা ব্লাউসের ভিতর থেকে ছোট্ট কৌটা বের করল। কৌটার ভিতরে সাদা ক্যাপসুল। সুরেশের দিকে চেয়ে বলে, আমি নিরস্ত্র নই। আপনার কাছে মিথ্যে দেমাক করি নি। এই বিষ মুঠোয় করে নিয়ে সাধুখাঁর দলের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার এই হাতিয়ার। ভেবে রেখেছিলাম: মরব। মেরে মরব—যারা আমার নানীকে মেরেছে, মামুকে মেরেছে, একরত্তি নিষ্পাপ নীলুফারকে অবধি মেরেছে। কিন্তু বাঁচবার গরজ আজকে আমার। আর বাঁচাবার। খুব বেশি করে বাঁচব। এ জিনিস আমি কাছে রাখব না।

বিষের ক্যাপসুল লায়লা নর্দামায় ছুঁড়ে দিল।

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA

এই লেখকের

মানুষ নামক জন্তু

রোমান্স হাসি-কান্না-অমায়িকতা—সভ্যতার মাজাঘষা নানান চেহারা। সঙ্কট-মুহূর্তে হঠাৎ সমস্ত ঝরে পড়ে, মানুষ-জন্তুর আসল মূর্তি বেরোয়। হিংস্র আর স্বার্থান্ধ, বীভৎস আর পৈশাচিক। মহৎ শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিক লেখনীতে কঠিন বিচিত্র চরিত্রের অপরূপ উদ্ঘাটন।

রক্তের বদলে রক্ত

হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা চলছে লাহোর ও কলকাতায়। চিরকালের চেনা মানুষের একেবারে ভিন্ন রূপ। দুনিয়া টলছে, পা রাখি কোথায়? সেই রক্তাক্ত দিনের নৃশংস ছবি। কিন্তু নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুদ্দীপ্তি—মানুষ ভালো, মানুষ সুন্দর, আশা ও বিশ্বাস রাখ জীবনের উপর। বাজিকরের দড়ির উপর দিয়ে চলার মতো শক্তিধর লেখনীর সৃষ্টি এই অনন্য উপন্যাস।

ভুলি নাই

বাঙলা দেশের রাজনীতির রুক্ষকঠিন শরীরেও যখন রোমান্টিক আদর্শবাদের একটি অপরূপ স্পর্শ লেগেছিল—সে হল অগ্নিযুগের কথা। সেই মহাযুগের মৃত্যুঞ্জয় সাধনাকে ভিত্তি করে একখানি অসাধারণ গ্রন্থ। শরৎচন্দ্রের পরে সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস।

সৈনিক

সৈনিক পান্নালাল। দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বাঙলায় কারামুক্ত হয়ে এক মুহূর্ত তার বিশ্রাম মিলল না। বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল সৈনিক যতদিন না আবার কারাপ্রাচীর সাময়িকভাবে তার গতিরোধ করল। সৈনিককে ঘিরে যে সমাজ, যার জন্যে তার সংগ্রাম, কুশলী লেখকের কলম তাকে নিঃশঙ্কভাবে উদ্ঘাটিত করেছে।

আগস্ট, ১৯৪২

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে '৪২-এর আগস্ট-আন্দোলন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। সেই আন্দোলনের আবর্তে অগণিত জনগণের আত্মত্যাগপূত এই

কাহিনী। তারই সঙ্গে রয়েছে সরকারি চাকুরিজীবী স্বামীর সঙ্গে স্বাধীনতা-সংগ্রামী স্ত্রীর নিরন্তর দ্বন্দ্ব, এবং মধুর মিলনান্ত উপাখ্যান।

বাঁশের কেল্লা

বাঙলার বিপ্লব-ঐতিহ্য অতি-পুরানো। নীলবিদ্রোহ থেকে বিয়াল্লিশের অগ্নিক্ষরা বিপ্লব অবধি কাহিনীর পরিক্রমা। এই উপন্যাসে ঐতিহাসিকের তথ্যানুসন্ধানী দৃষ্টির সঙ্গে কবির বৃহত্তর সত্যদৃষ্টির মিলন ঘটেছে।

নবীন যাত্রা

গ্রামোন্নয়নে নামবার আগে গ্রামকে চিনতে হয়, চিনতে হয় গ্রামে-গ্রামে ছড়ানো দেশের রূপটিকে।

বুনিয়াদী শিক্ষাদর্শের সার্থক সাহিত্যায়ন। লেখকের বহুমুখী প্রতিভার অত্যাশ্চর্য নিদর্শন। নয়া-দিল্লীর 'সস্তা সাহিত্য সংস্থা' বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে এর হিন্দি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন।

বৃষ্টি, বৃষ্টি,

রাজনৈতিক প্রবঞ্চনার সঙ্গে সংঘাত বাধল—ফলে সুস্থির থাকতে দিল না ইতিহাসের শান্তিকামী সাধককে। তারই সঙ্গে দুটি চরিত্রের নিভৃতচারী নিবিড় অনুরাগ। বহু চরিত্রের সমাগমে, বহুবিধ ঘটনার জটিলতায় অবশেষে কাহিনী মিলনের সমুদ্রসঙ্গমে এসে সুস্নাত শান্তি লাভ করল।

বকুল

জীবনের দেনা আর যৌবনের দাবি অমরেশ-জয়ন্তীর দাম্পত্য জীবনে যখন জটিল সংঘাতের সৃষ্টি করেছে, অমরেশের প্রথমা স্ত্রীর শিশুপুত্র বকুলের সেই সময় অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। সমস্ত কাহিনীর মোড় ঘুরে গেল এই বকুলকে কেন্দ্র করে। কোথায় ছিল সে এতদিন!

এক বিহঙ্গী

আকাশচারী এক বিহঙ্গ যেন স্বপনপশারী সেই মেয়ে। সমস্ত দৈনন্দিনতার ঊর্ধ্বে বিকশিত তার হৃদয়ের শতদল। তরুণ-তরুণীর মন-দেওয়া-নেওয়ার কাহিনী-গ্রন্থনে লেখক অনন্যসাধারণ। তারই স্মরণীয় উদাহরণ এক বিহঙ্গী।

জলজঙ্গল

সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের হাসি-কান্না আর সংগ্রামের কাহিনী। মাটি জল আর মানুষ একাকার হয়ে গেছে এই উপন্যাসে। জল ও জঙ্গল—তারাও জীবন্ত মানুষের পাশাপাশি চরিত্র হয়ে ফুটেছে। এ হেন উপন্যাস শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, পৃথিবীর যে-কোনও সাহিত্যের গৌরব।

শত্রুপক্ষের মেয়ে

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত প্রদেশে দক্ষিণ-বাংলার নদীবহুল বসতি-বিরল অঞ্চলে উদ্যোগী শক্তিমান পুরুষের দিন তখনও যায় নি। তাদের সুখ-দুঃখ নিয়ে মরমী লেখক যে কাহিনী রচনা করেছেন তা রূপকথার চেয়েও বিস্ময়কর।

ওগো বধূ সুন্দরী

বসন্ত গান-পাগলা মানুষ। সংসারের বন্ধন এড়িয়ে যেতে তার সমস্ত প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত কেমন করে ব্যর্থ হল, তারই কৌতুকস্নিগ্ধ মনোরম কাহিনী। অনুপম দৃশ্য প্রচ্ছদপটে উপহারের শ্রেষ্ঠ রুচিসম্মত বই।

সবুজ চিঠি

নাম, যশ, অর্থ এবং প্রতিপত্তি—এই কি জীবনের চরম লক্ষ্য? দয়িতার প্রেম, সন্তানের মায়া, আপন গৃহের ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ—সব ছেড়ে গিয়ে খ্যাতির তপস্যায় জয়ী হয়েও তাই পুরুষসিংহের জীবনের দাবদাহ মিটল না। মানব-মনের একটি দুজ্ঞের্য় রহস্যের আশ্চর্য উন্মোচন ঘটেছে এই উপন্যাসে।

আমার ফাঁসি হল

পরম শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু এই উপন্যাস সম্বন্ধে বলেছেন—"আপনি একেবারে নূতন রকম একটি সৃষ্টি করেছেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত নব রসের মধ্যে ভয়ানক আর বীভৎস রস লেখকরা পরিহার করে থাকেন।...আপনার গল্পটির প্রধান অবলম্বন ভয়ানক রস, তার সঙ্গে জল আর জঙ্গলের পরিবেশও আছে। সব সুদ্ধ মিশে গল্পটি মোহময় রহস্যময় অদ্ভুত এবং চমৎকার হয়েছে।"

মনোজ বসুর গল্প-সংগ্রহ

মনোজ বসুর বিচিত্রমুখী ও লীলাকুশলী শিল্পদৃষ্টির পরিচয় গল্পগুলিতে। গীতি-কবিতার মোহ ও রোমান্সরসের বর্ণবিচিত্র সমারোহের সঙ্গে মিশেছে বুদ্ধিধর্মী বিশ্লেষণ ও বাস্তব-ঘনিষ্ঠ জীবন-প্রজ্ঞা। তাই তাঁর কল্পদৃষ্টি যেমন বনমর্মরের

নিগূঢ় রহস্যজিজ্ঞাসায় অধীর, তেমনি জীবনের ক্ষণদীপ্ত খদ্যোত-মুহূর্তগুলিরও তিনি নিপুণ ভাষ্যকার। একদিকে ঐশ্বর্যদীপ্ত অলঙ্কৃত ভাষায় রাজকীয় উৎসব, আর একদিকে স্বল্পসঙ্কেত সূক্ষ্ম রূপকরণের লঘুলীলা। 'বনমর্মর' ও 'খদ্যোত' পুরা দুইখানা বই ছাড়াও অতিরিক্ত গল্প 'স্বয়ম্বরা'। অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়ের সুদীর্ঘ ভূমিকা।

বনমর্মর

বাংলার মাঠ-নদী বন আর তার সঙ্গে একাত্ম মানুষগুলির সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন থেকে তুলে নেওয়া কান্না-হাসি-বিরহ-মিলনের আলোছায়ায় স্নিগ্ধ-মধুর গল্পের সংকলন। রেখায়-রেখায় উন্মোচিত মানব-মনের নতুন দিগন্ত।

খদ্যোত

ছোট গল্প গল্পও হবে, ছোটও হবে—প্রমথ চৌধুরীর এই অভিমত আজ সর্বজনবিদিত। কিন্তু অত্যন্ত দুরূহ এই শিল্পকর্ম। বাহুল্যবর্জিত ঘটনা-পরম্পরায় একটি মূল চরিত্র কি একটি বিশেষ বক্তব্যকে অতুলন নিষ্ঠায় তুলে ধরা হয়েছে।

উলু

"ছোটখাটো ট্রাজেডি যাহা একটি অখ্যাত মানুষকে বা তাহার পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরে ঘটে তাহার রূপ আমাদিগকে অভিভূত করে। উলু এই রকম অভিভূতকরা ট্রাজেডি গল্প।"

দিল্লি অনেক দূর

স্বাধীনতা পেয়েছি—কত সাধ আর স্বপ্নের স্বাধীনতা! দিল্লি তবু অনেক দূরে রয়ে গেল এখনো। স্বাধীন জনগণের বেদনা-আনন্দ ও অবসাদ-প্রত্যাশার নানা কাহিনী। বাংলা গল্পের পরিক্রমা ক্ষেত্রবিশেষে নিরুদ্ধ নেই—এই গ্রন্থ তার বিস্ময়কর নিদর্শন।

দুঃখ-নিশার শেষে

অন্যের লেখার দু-এক ছত্র উদ্ধৃতি দিলেই হবে: শনিবারের চিঠি বলেন 'বর্তমান গল্প-সংগ্রহে মনোজ বসুর আধুনিক দৃষ্টির চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হইল।' অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন 'Will be gratefully remembered as herbinger of a new intellectual order'

পৃথিবী কাদের

নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে কোন মেজাজের গল্পের সংকলন। অমৃতবাজার বলেছিলেন 'It is a departure in the fiction literature of the Province'

কুঙ্কুম

বাইশটি অতি-ছোট এবং মাঝারি গল্পের এই সংকলনটি বিষয়-বৈচিত্র্যে শুধু নয়, পরিহাসস্নিগ্ধ প্রশান্ত শিল্পদৃষ্টির উদ্ভাসনেও বিশিষ্ট হয়ে থাকবে। মানুষের অন্তর্জগতের বহুতর রহস্যের আশ্চর্য বাণীরূপ।

কিংশুক

শুধু মন-দেওয়া-নেওয়ার মিষ্টি উপাখ্যান নয়, তারই সমান্তরাল ভাবে তুলে ধরা হয়েছে তথাকথিত দেশনেতার ভণ্ডামির অবিকল চিত্র, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ভাড়াটে সৈনিকের অন্তিম পরিণামের মর্মন্তুদ কাহিনী। বিচিত্র রসের স্মরণীয় চোদ্দটি অতি-ছোট ও মাঝারি গল্প।

নরবাঁধ

সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের দুটি গল্পের গ্রন্থন নরবাঁধ। এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে মোহিতলাল '...ঐ দুইটি গল্প যিনি লিখিয়াছেন, তিনি, তিনি আর কিছুই লিখুন বা না লিখুন, কেবল ঐ দুইটির জন্য বাঙলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের চত্বরে স্থায়ী আসন লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সে আসন অতি অল্প কয়েকজনই দাবি করিতে পারেন।'

দেবী কিশোরী

চেনা মানুষ আর তার চেনা কতকগুলি স্বাভাবিক বৃত্তি; প্রেম স্নেহ, আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ ইত্যাদির মধ্যেই তাঁর শিল্পীমানসের ভিত্তি দৃঢ়মূল। 'দেবী কিশোরী'র গল্পগুচ্ছে এই সত্যেরই আলো প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

একদা নিশীথ-কালে

ন-টি সরস গল্পের সংকলন 'একদা নিশীথকালে'। এক শান্ত গভীর জীবনবোধ থেকে উৎসারিত অপরূপ স্বাদের বিচিত্র এই গল্প ক'টিতে মনোজ বসুর শিল্পীসত্তার সম্পূর্ণ নতুন পর্যায়ের উন্মোচন ঘটেছে। কৌতুকস্নিগ্ধ এক আশ্চর্য পরিহাসের আভায় গল্পগুলি উজ্জ্বল।

কাচের আকাশ

পরিবেশ রচনার অসামান্য দক্ষতায় এবং তার মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলিকে সজীব করে তোলার দুর্লভ ক্ষমতায় এই লেখক প্রায় তুলনারহিত। প্রতিটি গল্পেই সংবেদনশীল কথাকারের মমতার স্পর্শ তথা মানবিক-বোধ অন্তর্লীন।

মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প

বাছাই-করা কতকগুলি গল্পের সংকলন। এই একখানা বইয়ের ভিতরেই মনোজ বসুর আশ্চর্য সৃষ্টিবৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। লেখকের জীবন-কথা, ছবি এবং অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের রসসমৃদ্ধ ভূমিকা বইয়ের মর্যাদা বাড়িয়েছে।

সোবিয়েতের দেশে দেশে

'মনোজ বাবুর সোবিয়েতের দেশে দেশে আমাদের মত গৃহকোণে আবদ্ধ জীবদের ভ্রমণের পিপাসা মেটায়, বৈঠকী গল্পের ক্ষুধা মেটায়, প্রচণ্ড বিতর্ক ও কৌতূহলের বস্তু সোবিয়েত দেশ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানিয়ে দেয়। বুঝা যায় সোবিয়েত দেশ, অন্ধকার পাতালপুরীও নয়, দিব্যধাম স্বর্গও নয়—অন্ধকার পাতালপুরী থেকে উদ্ধার পেয়ে নতুন জগৎ ও জীবন নির্মাণরত একটি বিচিত্র ও বিপুল মানবগোষ্ঠী।' —স্বাধীনতা

চীন দেখে এলাম

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব

১৯৫২-৫৪ তিন বছরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পুস্তক হিসাবে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ দাস পুরস্কার-প্রাপ্ত। 'ভ্রমণের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে তিনি সাহিত্যের রসে স্নিগ্ধ করে নিয়েছেন; মাধুর্যময় ভঙ্গিতে তার একটা আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়েছেন। সে বর্ণনা সুন্দর, রসোত্তীর্ণ। লেখকের পরিহাস-রসোজ্জ্বল চিত্তেরস্পর্শে তা আরও মাধুর্যময় হয়েছে।'

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

নতুন ইয়োরোপ ঃ নতুন মানুষ

'জর্মন আকাদেমি অব আর্টস' থেকে চার জন ভারতীয় লেখক নিমন্ত্রিত হন। লেখক সেই দলের একজন।

বার্লিন শহর শুধু নয়, জর্মন দেশের অভ্যন্তরে হাজার হাজার মাইল তাঁরা ঘুরেছেন। ভারতের খুব কম লেখকই গেছেন সে-সব জায়গায়।

ইয়োরোপে না গিয়েও আপনি চোখের উপর যুদ্ধোত্তর ইউরোপ দেখতে পাবেন। শুধু মাত্র কলমের ছবিই নয়, দুর্লভ ফটোচিত্রও অনেক সে সব ছবি বিশেষ করে এই বইয়ের জন্য তুলে আনা হয়েছে।

পথ চলি

ডাঙার পথ, জলের পথ, আর আকাশ-পথ। নগণ্য গ্রাম-জীবন থেকে শুরু করে অর্ধেক দুনিয়া লেখকের পায়ের তলায়। কত মানুষ, কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা! যেন আসর সাজিয়ে বসে মনোরম ভঙ্গিতে বলে যাচ্ছেন—রম্যরচনা, ভ্রমণকথা, স্মৃতিচিত্র, কাহিনী-প্রচয়—সমস্ত কিছু মিলিয়ে এক পরমাশ্চর্য সৃষ্টি।

নূতন প্রভাত

পরাধীনতার পাপ যখন ভারতীয় জাতিচরিত্র কলুষিত করতে উদ্যত, তখনই যুগসঞ্চিত পুণ্যের ফলে যুবশক্তি জেগে উঠে অজ্ঞানতার কুয়াশা মোচন করে জাতির জাগরণ ঘটিয়েছিল। তেমনি একদল আলোকবাহী তরুণ-তরুণীর সংগ্রাম, দুঃখবরণ, আকাঙ্ক্ষা ওবিশ্বাসের তীব্র নাটকীয় প্রতিফলন।

বিপর্যয়

হিরণ্ময় চৌধুরির বুদ্ধি ও মেধা ছিল অসাধারণ, আর ছিল অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আর কিছু ছিল না। না, ছিল—ছিল সুনাম। তাই সে বিক্রি করল। খ্যাতি ও প্রতিপত্তি মিলল। কিন্তু ততদিনে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে শান্তি ও আনন্দের সংসার। 'রঙমহল' রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-সফল নাটক।

প্লাবন

'নাট্যভারতী' মঞ্চে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরির পরিচালনায় অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক। একটা বিরাট এবং ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে নাটকের চরম মুহূর্ত নিহিত; "প্রজাবন্ধু" শেখরনাথের খুন হওয়ার দৃশ্য থেকে আরম্ভ করে প্লাবনের রাত্রে নীলাম্বরের পরিচয় প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি দৃশ্য রুদ্ধশ্বাস নাটকীয় উত্তেজনায় সমৃদ্ধ।

শেষলগ্ন

বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের শ্যামলী কন্যার প্রতি সমাজের হৃদয়হীন অনুদারতা নিয়ে হাসি- অশ্রুর বিচিত্র টানাপোড়েন। বহুপঠিত 'উলু' গল্পের গৌরীর অশ্রুসজল ট্র্যাজেডি মননশীল কথাকারের উদ্ভাবন-বৈশিষ্ট্যে সুষ্ঠু মিলনান্ত পরিণতি লাভ করেছে। রঙমহলে শতাধিক রজনী অভিনীত জনসমাদৃত নাটক।

বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং

একটা হীন ষড়যন্ত্র থেকে অমিতাকে উদ্ধার করে নীলাদ্রি তাকে বাড়ি পৌঁছতে যাচ্ছিল। পথে মোটর-দুর্ঘটনায় পড়ে তারা দুজনে উঠল 'বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং-হাউসে'। তারপর বহু বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত মধুর মিলন। মিষ্টি গল্পে মনোজ বসুর যে খ্যাতি প্রায় প্রবাদের মতো, এই লঘুছন্দ নাটকে তার পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

রাখিবন্ধন

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-আইনের বিরুদ্ধে রাখিবন্ধনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে জেগে উঠেছিল একদা বাংলার যুব-সমাজ। মৃত্যুপণ সেই আন্দোলনের চরম লক্ষ্য স্বাধীনতা—তার রূপ কি সার্থক হয়ে উঠেছে আজকের এই দ্বিখণ্ডিত বাঙলায়? এই ট্র্যাজেডির সুর অপূর্বসূক্ষ্মতায় প্রতিবিম্বিত করেছেন মনোজ বসু 'রাখিবন্ধন' নাটকে।

ডাকবাংলো

'বৃষ্টি, বৃষ্টি' উপন্যাসের নাট্যরূপ। দেবনারায়ণ গুপ্ত নাট্যায়িত। স্টার থিয়েটারে বিপুল সমারোহে অভিনীত।